পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা
৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিঃ ॥ ৩১শে আষাঢ়, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই জুলাই, ১৯৯৭ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ—আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ভালবাসা	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	২
অমৃত বাণী : মকামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম	:		৫
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৭
জুমুআর খুৎবা সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	:	অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর রসূল-প্রেম মূল : মোকাররম সিদ্দীক আশরাফ আলী, কাদিয়ান	:	অনুবাদক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৯
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		৩৬
সম্পাদকীয়	:		৩৯

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন :

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيقًا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১৫ই জুলাই, ১৯৯৭ : ১৫ই ওফা, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ৩১শে আষাঢ়, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান—৩

৩০। তুমি বল, 'তোমাদের বক্ষদেশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, আল্লাহ্ উহা জানেন, এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৩১। (সেই দিনকে ভয় কর) যেদিন প্রত্যেক আত্মা যে কোন উত্তম কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিজের সম্মুখে উপস্থিত (দেখিতে) পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও (উপস্থিত দেখিতে পাইবে)। সে তখন কামনা করিবে, হায়! যদি উহার এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান হইত। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (অর্থাৎ তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি অতি মমতাশীল।

৩২। তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ (৩৯৮) কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর; কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

৩৯৮। এই আয়াত দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর অনুগমন ও আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাপ্তির অন্য সকল পথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ২:৬৩ আয়াত দ্বারা শুধু আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখিলে মুক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হইতে পারিত, এই আয়াত উহা সুস্পষ্টভাবে অপনোদন করিয়া দিয়াছে।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি ভালবাসা

হাদীস ঃ-

عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله و رسوله احب اليه مما سواهما و ان يحب المرء لا يحبه الا لله و ان يكره ان يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف فى النار (بخارى كتاب الايمان)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তিনটি এমন বিষয় আছে যে, যার মধ্যে এগুলি থাকবে সে ইহার বদৌলতে অবশ্যই ঈমানের মধুর স্বাদ অনুভব করবে। প্রথমতঃ তার মনে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল বাকি সকল বস্তু অপেক্ষা সর্বাধিক প্রিয় হওয়া ; দ্বিতীয়তঃ শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরে কাকেও মহব্বত করা ; তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌ তাকে কুফরী অবস্থা হতে রক্ষা করার পর পুনরায় উহাতে ফিরে যাওয়াকে এত ঘৃণা করে যেরূপে সে তার আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

ব্যাখ্যা ঃ- ইহা নির্ভুল সত্য কথা যে, যদি কেহ জ্ঞান-বিদ্যাকে ভালবাসতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই তার শিক্ষক এবং গুরুকেও ভালবাসতে হবে। সে যতটুকু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত তার শিক্ষক এবং গুরুকে ভালবাসবে এবং তাদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করবে সেই সূত্রে সে ততটুকুই জ্ঞান ও বিদ্যার দুধ শিক্ষকদের নিকট হতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে চুষতে থাকবে এবং আহরণ করতে থাকবে। দেখা গিয়েছে যে, যারা গুরু ও শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা ও অমর্যাদা প্রকাশ করে অবশেষে তারাই জ্ঞান ও বিদ্যার আলো হতে বঞ্চিত থাকে এবং তিমিরপুঞ্জে হাবুডুবু খেতে খেতে দুনিয়া হতে বিদায় নেয়।

ইতিহাসে লেখা আছে যে, আব্বাসী সম্রাটগণের মধ্যে ঐশ্বর্যশালী সম্রাট হারূনুর রশীদ তার দুই পুত্রের শিক্ষাদীক্ষার জন্য একজন বুযুর্গ শিক্ষক রেখেছিলেন যিনি রাজপ্রাসাদে এসে তাদিগকে শিক্ষা দান করতেন। একদিন সম্রাট হারূন ঐ দিক দিয়ে রাজ দরবারে যাচ্ছিলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তার দুই রাজকুমার শিক্ষককে ওযু করাচ্ছেন, একজন সুরাহি দিয়ে শিক্ষকের পায়ের উপর পানি ঢেলে যাচ্ছেন এবং অপর জন শিক্ষকের পা নিজ হাতে ধুয়ে

যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে রাজ দরবার থেকে সম্রাট শিক্ষককে ও দুই রাজকুমারকে ডেকে পাঠালেন। শিক্ষক চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়লেন যে, দুই রাজকুমার দ্বারা এইরূপ সেবা গ্রহণ করায় হয়তো রাজ পরিবারের ঐশ্বর্য ও আদব-কায়দা ভঙ্গ করা হয়েছে। তাই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সম্রাটের সম্মুখে হাযির হলেন। সম্রাট বললেন, আজকে আমি শিক্ষক ও শাগরেদদের মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক দেখে অনেক আনন্দিত হলাম। এইরূপ শিক্ষক কখনো মরতে পারে না এবং এইরূপ শাগরেদগণও কখনো জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে খালি হাত ফিরে যেতে পারে না।

বস্তুতঃ শিক্ষক ও শাগরেদদের মধ্যে এইরূপ প্রাণঢালা এবং মধুর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন শিক্ষক পরম স্নেহ-মমতা, আন্তরিকতা এবং হিতৈষণার সহিত সাগরেদদেরকে শিক্ষা ও তরবীয়ত প্রদান করেন এবং তাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বিগলিত অন্তরের দোয়ার মূর্তিমান আদর্শ হয়ে যান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে তদ্রূপই কামেল শিক্ষক রূপে দুনিয়াতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাবারকতা'লা বলেছেন:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهتهم ط

অর্থাৎ এই নবী মোমেনগণের জন্যে তাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা। (৩৩:৭)

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین
رءوف رحیم ٥

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্য হতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্যে দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মোমেনদের প্রতি সে অতীব মমতাশীল পরম দয়াময়। (৯:১২৮)

সুতরাং বুঝা গেল, শিক্ষক হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম সর্বাঙ্গীণরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন যা দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি কেহ পালন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত অবধি কেহ পারবে না। তাই তাঁর শাগরেদী এবং অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে খোদা প্রাপ্তির রহস্য; যেমন আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন:

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم -

অর্থাৎ তুমি বল (হে রসূল!) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর ফলে আল্লাহ্ ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। (৩:৩২)

যেরূপভাবে আমরা দেখতে পাই, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিদ্যার প্রতি যত আগ্রহ ও আশক্তি রাখে ততই জ্ঞান ও বিদ্যার উৎস ও আকর গুরু এবং শিক্ষকের প্রতিও আগ্রহ এবং আসক্তি প্রকাশ করে এবং তার সামনে নতজানু হয়ে চলে। ইহাই স্বাভাবিক কথা এবং ইহাই জ্ঞানার্জনের মহৎ উপায়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও যে যতটুকু খোদাকে ভালবাসবে ততটুকুই সে খোদার দিকে সন্ধানদানকারী ও পথ-নির্দেশককেও অবশ্যই ভালবাসবে। এই হিসাবেই নবী করীম (সাঃ) এই মর্মে বলেছেন যে, যেহেতু খোদা সর্বাধিক কাম্যসত্তা, তাই তাঁকে লক্ষ্যবস্ত বানিয়ে তোমাদেরকে তার প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা নিবেদন করতে হবে; আর যেহেতু আমি তোমাদেরকে তাঁর অনুসন্ধান দান করছি ও পথ-নির্দেশ করছি, তাই আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা খোদাকে পাইতে পার না। খোদার পরে আমার প্রতিও প্রগাঢ় ভালবাসা তোমাদিগকে নিবেদন করতে হবে।

যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস সালাম কতই না সুন্দর কথা বলেছেন:

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

অর্থাৎ খোদার পরে মুহাম্মদের ভালবাসায় আমি বিভোর, ইহাকে যদি তোমরা কুফরী কাজ বল, তাহলে খোদার কসম, আমি সব চাইতে বড় কাফের।

আর একটি হাসীসে এসেছে যা হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করছেন যে, একবার এক মরুবাসী নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! কেয়ামত কখন হবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করলেন (কেয়ামত তো হবেই হবে কিন্তু) তুমি উহার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? তিনি উত্তরে বললেন, (আর তো বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করি নি, তবে) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি আমার অন্তরে প্রগাঢ় ভালবাসা রয়েছে। হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করলেন, তুমি যাকে ভালবাসো তার সঙ্গে তুমি থাকবে। অপর একটি রেওয়ায়াতে এসেছে যে, মরুবাসী বলে ছিলেন যে, বেশী বেশী নামায, রোযা এবং সদকার মাধ্যমে আমি কেয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি নি, কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে বালবাসি। (বোখারী: কিতাবুল আদব)

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

মকামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম

"সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতিঃ যাহা মানবকে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, তাহা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীসমূহে ছিল না, তাহা মুক্তা, মাণিক্য, পান্না, মতিতেও ছিল না। বস্তুতঃ তাহা পৃথিবী ও আকাশের কোন বস্তুতেই ছিল না, কেবল মাত্র মানবের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে। তিনি হইলেন শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম অস্তিত্ব আমাদের নেতা ও প্রভু নবীগণের নেতা, অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম। অতএব এই জ্যোতিঃ পূর্ণ মানবকে দান করা হইয়াছে, এবং মর্যাদানুসারে তাহাদিগকেও কিছু দান করা হইয়াছে যাহারা তাঁহারই মতন কিছু গুণ রাখিত—এই মর্যাদা উচ্চতা ও পূর্ণতাসহ এবং পূর্ণাঙ্গীনভাবে কেবলমাত্র আমাদের হাদী, নবী, উম্মী "সাদেক" ও "মাসদূক" মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের মধ্যেই পুঞ্জীভূত।" (রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, ১৬০ পৃঃ)

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবী নবী যঁাহার পবিত্র নাম মুহাম্মদ। হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁহার উপর, তিনি যে কত উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁহার সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে এবং তাঁহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

খোদাতা'লা যিনি তাঁহার (সাঃ) অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন, তিনি তাঁহাকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২ খণ্ড, ১১৪ পৃঃ)

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামের মধ্যে সকল নবীগণের নাম নিহিত আছে। কেননা, তিনি সকল নবীগণের গুণাবলীর সমষ্টি। সুতরাং তিনি মূসা, ঈসা, ইব্‌রাহীম, ইউসুফ ও ইয়াকুবও। এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া খোদাতা'লা বলিয়াছেন।

"ফাবেহুদাহুমুকতাদেহ" (সূরা আনআম : ৯১ আয়াত) অর্থাৎ, তুমি ঐ সকল হেদায়াত-গুলিকে নিজের মধ্যে একত্রিত করিয়া লও যাহা বিশেষতঃ প্রত্যেক নবীর সহিত ছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল নবীর শান ও মর্যাদা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের নাম এই ইঙ্গিত বহন করে। কেননা 'মুহাম্মদ' শব্দটির অর্থ হইল, যাঁহার অপরিসীম প্রশংসা করা হইয়াছে এবং অপরিসীম প্রশংসা তখনই হইতে পারে যখন সকল নবীর কল্যাণ ও গুণাবলী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকে।"

(রূহানী খাযায়েন-পঞ্চম খণ্ড, ৩৪৩ পৃ:)

"আমাকে এই জ্ঞান দান করা হইয়াছে যে, রসূলগণের মধ্যে কামেল শিক্ষক, উচ্চতর পবিত্র ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ শিক্ষাদানকারী এবং নিজ সত্তা দ্বারা মানবীয় গুণাবলীর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শনকারী একমাত্র হযরত সাইয়েদনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামই।" (রূহানী খাযায়েন-১২ খণ্ড, ৩৪৫ পৃ:)

"যখন আমি ইনসাফের দৃষ্টিতে নবুওয়তের সকল ব্যবস্থাকে দেখি, তখন শ্রেষ্ঠ নবী, জীবিত নবী এবং খোদার সর্বাধিক প্রিয় নবী শুধু এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাই। অর্থাৎ তিনি নবীগণের নেতা, রসূলগণের গৌরব, প্রেরিতগণের মুকুট, যাঁহার নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম।"

(রূহানী খাযায়েন-১২ খণ্ড, ৭২ পৃ:)

"আরবের অরণ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জীবিত হইয়া গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলি খোদার রঙে রঙীন হইয়া গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হইল। মূকদের কণ্ঠে খোদার তত্ত্ব-জ্ঞান জারী হইল। পৃথিবীতে একবারই এইরূপ বিপ্লব ঘটিল যে, পূর্বে না কেহ ইহা দেখিয়াছে, না কেহ শুনিয়াছে। তোমরা কি জান, উহা কী ছিল? উহা একজন 'ফানাফিল্লাহ' (যিনি আল্লাহ্‌তে বিলীন হইয়াছেন) এর অন্ধকার গভীর রাত্রির দোয়াই তো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং ঐ অদ্ভুত ঘটনা ঘটাইয়া দেখাইলেন, যাহা এই নিরক্ষর অসহায় ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল।" (রূহানী খাযায়েন, ৬ খণ্ড, ১০ পৃ:)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হাকীকাতুল ওহী

[মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২৪তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

যেহেতু নবাব সিদ্দীক হাসান খানের হৃদয়ে শুষ্ক ওহাবীয়তের উপাদান ছিল, তাই তিনি অন্য জাতিদিগকে কেবল মাহদীর তলোয়ার দ্বারা ভয় দেখাইলেন। অবশেষে তিনি পাকড়াও হইলেন এবং তাহার নবাবের খেতাব রহিত করা হইল। তিনি বড়ই বিনয়ের সহিত তাহার জন্য দোয়া করিতে আমাকে চিঠি লিখেন। এমতাবস্থায় আমি তাহাকে করুণার যোগ্য মনে করিয়া তাহার জন্য দোয়া করিলাম। তখন খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, শিরোচ্ছেদ হইতে তাহার ইজ্জত বাঁচানো হইল। আমি এই সংবাদ চিঠির মাধ্যমে তাহাকে দিয়া দিলাম এবং কয়েকজন লোককেও এই সংবাদ দিলাম যাহারা ঐ সময় আমার বিরুদ্ধবাদী ছিল। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে অমৃতসরের জেলা সেচ অফিসার হাফেয মোহাম্মদ ইউসুফ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ও মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে কিছুদিন পর তাহার সম্পর্কে সরকারের নির্দেশ আসিল যে, সিদ্দীক হাসানের নবাবী খেতাব কায়েম থাকিবে। ব্যাপারটিকে এইভাবে গ্রহণ করা হইল যে, তিনি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন উহা তাহার পুরাতন ধর্মীয় ধারণা, যাহা তাহার অন্তরে ছিল। তাহার বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল না।*

৫। পঞ্চম নিদর্শনটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা ১৯০৬ সালের মে মাসের রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স এর প্রচ্ছদের শেষ পৃষ্ঠার প্রথম অংশে লিপিবদ্ধ আছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটিই ১৯০৬ সালের ১০ই মে তারিখে বদর পত্রিকার ৫ম খণ্ডের ১৯ নম্বরে মুদ্রিত আছে। এতদ্ব্যতীত ইহা ১৯০৬ সালের ১০ই মে তারিখে ব্যাখ্যাসহ আল্ হাকাম পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথমে আমি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি এই জায়গায় লিখিতেছি, যাহা

---

* টীকা : নবাব সিদ্দীক হাসান খানের এই যে পরীক্ষা আসিল, উহাও আমার একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ফল, যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি আমার বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ টুকরা করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার ইজ্জতকেও টুকরা করিয়া দেওয়ার জন্য আমি দোয়া করিয়াছিলাম। অতএব এইরূপই ঘটিল (বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ)।

উল্লেখিত ম্যাগাজিনে ও তুইটি পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরে যেভাবে উহা পূর্ণ হইয়াছে তাহা লিখিব। ঐ সময়ের ব্যাখ্যাসহ ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নরূপ :

"১৯০৬ সালের ৫ই মে তারিখের ইলহাম—

پھر بہار آئی تو آئے ثلج کے دن

(অর্থ : আবার বসন্ত আসিল। তখন বরফ পড়ার দিন আসিল—অনুবাদক)। ثلج শব্দটি আরবী। ইহা ঐ বরফ, যাহা আকাশ হইতে পড়ে এবং যাহা তীব্র শীতের কারণ হইয়া থাকে ও উহার ফলে বৃষ্টি হয়। ইহাকে আরবীতে ثلج বলা হয়। এই অর্থের ভিত্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থ মনে হয় যে, বসন্তকালে আমাদের দেশে খোদাতা'লা অস্বাভাবিকভাবে এই বিপদ অবতীর্ণ করিবেন এবং বরফ পড়িবে ও উহার ফলে তীব্র শীত প্রবল বৃষ্টিপাত দেখা দিবে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে বরফ পড়িবে। উহা তীব্র শীতের কারণ হইয়া যাইবে)। আরবীতে ইহার দ্বিতীয় অর্থ হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করা। অর্থাৎ কোন ব্যাপারে মানুষের এইরূপ যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য হাতে আসিয়া যাওয়া, যাহা দ্বারা তাহার হৃদয় প্রশান্ত হইয়া যায়। এই কারণেই বলা হয় অমুক লেখা হৃদয়ের ثلج (প্রশান্তি) এর কারণ হইয়া গেল। অর্থাৎ এইরূপ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করা হইয়াছে, যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তি লাভ হইয়াছে। এই শব্দটি কখনো কখনো আনন্দ ও আরামের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে, যাহা হৃদয়ের প্রশান্তির পর সৃষ্টি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যখন মানুষের হৃদয় কোন ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন উহার ফলশ্রুতিতে খুশী ও আনন্দ নিশ্চয় পাওয়া যায়। মোট কথা, এই ভবিষ্যদ্বাণী এই সকল দিক সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা চিন্তা করিলে নিশ্চিতরূপে এই কথাটি অনুভব করা যায় যে, যদি এস্থলে খোদাতা'লার নিকট ثلج এর দ্বিতীয় অর্থ হয়, অর্থাৎ সকল সন্দেহ ও সংশয় দূর করা এবং পূর্ণ প্রশান্তি দান করা তবে এস্থলে এই বাক্যের এই অর্থও হইবে যে, বিগত দিনগুলিতে ভূমিকম্প সম্পর্কে বক্রস্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল এবং মানুষ আত্মার প্রশান্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রশান্তি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছিল, এই জন্য বসন্ত ঋতুতে এইরূপ একটি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে যদ্বারা হৃদয় প্রশান্ত হইয়া যাইবে, বিগত সন্দেহ-সংশয় সব দূর হইয়া যাইবে, এবং 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই ইলহাম সম্পর্কে অধিক ভাবিলে ইহাই বোধগম্য হয় যে, বসন্তের দিন পর্যন্ত না কেবল একটি নিদর্শন বরং কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া যাইবে। যখন বসন্ত ঋতু আসিবে তখন এইরূপ উপর্যুপরি নিদর্শনের দরুন হৃদয়ে এইরূপ ক্রিয়া হইবে যে, বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সত্যান্বেষীদের হৃদয় পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করিবে। এই বর্ণনা এই ভিত্তিতে করা হইয়াছে যে, ثلج এর অর্থ প্রশান্তি লাভ করা ও সন্দেহ-সংশয় হইতে মুক্ত হওয়া মনে করা হইবে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ বরফ ও বৃষ্টি হয় তবে খোদাতা'লা অন্য কোন

আসমানী বিপদ অবতীর্ণ করিবেন। و الله اعلم بالصواب (অর্থ: আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা সঠিক জানেন—অনুবাদক)।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা ব্যাখ্যাসহ রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স ম্যাগাজিন ও বদর এবং আল্-হাকাম পত্রিকায় উহার (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর) প্রকাশের নয় মাস পূর্বে লেখা হইয়াছিল এবং উহার প্রকাশের জন্য বসন্ত ঋতু নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। অর্থাৎ ঠিক যখন বসন্ত ঋতু আসিল এবং বাগান ফুলে ও কলিতে ভরিয়া গেল তখন খোদাতা'লা তাঁহার ওয়াদা এইভাবে পূর্ণ করিলেন যে, কাশ্মীর, ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে সীমাতিরিক্ত বরফ পড়িল। ইনশাল্লাহ্, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখনই আমি কতিপয় পত্রিকার হাওলা দ্বারা লিখিব। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন এই দেশে এত শীত পড়িল ও বৃষ্টিপাত হইল যে, দেশের মানুষ ফরিয়াদ করিয়া উঠিল। ইহার সাথে সাথে এই দেশের কোন কোন অংশে এত বরফ পড়িল যে, লোকেরা অবাক হইয়া গেল যে, এই কি হইতে যাইতেছে। বস্তুতঃ আজই ১৯০৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কাশ্মীর হইতে হাজী ওমর ডার সাহেবের (ইনি কাশ্মীরের অধিবাসী। বর্তমানে ইনি আমার নিকটে কাদিয়ানে আছেন) নামে তাহার পুত্র আব্দুর রহমানের নিকট হইতে চিঠি আসিয়াছে। চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, এই সময় এত বরফ পড়িতেছে যে, মাটি হইতে তিন গজ উচ্চতা পর্যন্ত বরফ জমিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যহ সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। ইহাতে কাশ্মীরের লোকেরা অবাক হইয়াছে যে, বসন্ত ঋতুতে এত বরফ পড়া একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই দেশে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে উহার সাক্ষাৎ কয়েকটি পত্রিকার হাওয়ালা হইতে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে:

প্রথমতঃ ১৯০৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর লাহোরস্থ 'আম' পত্রিকা হইতে সংক্ষিপ্তাকারে লেখা হইতেছে। বস্তুতঃ উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বৃষ্টিপাতের এই অবস্থা লেখা হইয়াছে:

"লাহোরে অবস্থা এই যে, দুই সপ্তাহের অধিক সময় হইতে মেঘ পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে এবং মানুষকে খুশী করার পরিবর্তে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। দুই দিন পর্যন্ত আকাশ বৃষ্টি মুক্ত ছিল এবং মনে হইতেছিল যে, এখন ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু রবি ও সোমবারের মধ্যবর্তী রাতের শেষ অংশে এত জোরে ও প্রবল বেগে বৃষ্টি হইয়াছে যে, মানুষ বিছানায় শুইয়া উচ্চ স্বরে তওবা করিতেছিল এবং হয়রান হইতেছিল, খোদা না করুন, বৃষ্টি রহমতের পরিবর্তে দুঃখ-কষ্টের কারণ না হইয়া যায়। ইহার সাথে সাথে বিজলীও খুব চমকাইল। উহা চোখকে ধাঁধাইয়া দিতেছিল। ইহার সাথে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের কড় কড় ধ্বনি হৃদয়কে কাঁপাইতেছিল। কিছুই বুঝা যাইতেছিল না খোদাওয়ান্দের কি ইচ্ছা। এই ঋতু ও এই বৃষ্টি চাষাবাদের দিক হইতে নিশ্চয় খুব উপকারী ও মোবারক। কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। এই উদাহরণটি বিখ্যাত যে, আধিক্য যে কোন ভাল জিনিষকেও মন্দ করিয়া দেয়।

(ক্রমশঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই ডিসেম্বর, '৯৫ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরব্বী

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনন্য শান ও মর্যাদা

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর সূরা আন্ নিসা : ১৭৫ ও ১৭৬ তম আয়াত তেলাওয়াত করেন্।

يايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا o
فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل
و يهديهم اليه صراطا مستقيما o

অতঃপর হুযূর বলেন :

যে ছুটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এর তরজমা এবং ব্যাখ্যার পূর্বে আমি ঘোষণা করতে চাই যে, নিউজিল্যাণ্ড জামা'তের ৭ম সালানা জলসা রবিবার ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং উক্ত জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বিশ্বব্যাপী সব জামাতকে আস্সালামু আলায়কুমও পৌঁছিয়েছেন এবং এই উপলক্ষে তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন। যে-আয়াত ছুটি তেলাওয়াত করেছি সে-গুলোর তরজমা হচ্ছে : يايها الناس قدجاء كم برهان من ربكم হে মানবমণ্ডলী নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য প্রমাণ এসেছে। — و انزلنا اليكم نورا مبينا এবং আমরা তোমাদের দিকে এক খোলাখুলি উজ্জ্বল নূর নাযেল করেছি। — فاما الذين امنو بالله و اعتصموا به অতএব ঐ সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে মযবুতভাবে অবলম্বন করে, فسيدخلهم في رحمة منه —নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর নিজস্ব রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন و فضل এবং ফযল বা আশীর্বাদেও و يهديهم اليه صراطا مستقيما—এবং নিজের দিকে সত্য-সরল পথে পরিচালিত করবেন —যে পথ সরাসরি খোদার দিকেই যায়। অতএব, সিরাতে মুস্তাকীমের আগে যে ক'টি শর্তের উল্লেখ রয়েছে তা পূরণ হলে উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী সফল হবে। প্রথমটি হচ্ছে যে পথ সোজা খোদার দিকে নিয়ে যায়, সে-পথে তোমরা পরিচালিত হও।

এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে তরজমা পেশ করেছেন তাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকেও নূর বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কুরআন করীমকেও। এ ভাবেই উক্ত বিষয়টির বর্ণনা কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায়ও বিদ্যমান রয়েছে, যা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যকীয়। বহু বারই যেখানে আমি সাধারণ প্রচলিত তরজমা থেকে ভিন্নমত পোষণ করছি। সেখানে উহার একটি কারণ ইহাও যে, আমার মতে যখন কোথাও সর্বনামকে খোলা রাখা হয়—নির্দিষ্ট করা হয় না, যার দরুন কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয়ের দিকেই উহা আরোপ হতে পারে, অর্থাৎ কোন আয়াতের অঙ্গুলি-নির্দেশ যে-দিকে যায় সে-দিকটিতে যদি পবিত্র কুরআনকেও বিদ্যমান দেখা যায় এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও তাহলে সেখানে এ কথা বলা সঠিক নয় যে, তা কেবল কুরআনের দিকেই নির্দিষ্ট, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে নয়, অথবা কেবল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকেই, কুরআনের দিকে নয়। বরং সেখানে অবধারিতভাবে উভয়ের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ প্রযোজ্য, উভয় সে-ইঙ্গিতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ ও-সব আয়াতের যে বিষয়-বস্তু পরে উন্মোচিত হয় তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন করীম নিজের এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্‌র মাঝে প্রায়শঃ কোন পার্থক্য করে না। বরং একই ইঙ্গিতের মাঝে উভয়কে শামিল করে। সুতরাং এ আয়াতটিও সে একই শ্রেণীভুক্ত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিরামাতুস্-সাদেকীন' গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতটির তরজমা এরূপই করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"অতঃপর, অবশিষ্ট আয়াতসমূহের আমরা অনুবাদ করে লিখছি" অর্থাৎ তিনি এই বলে এ আয়াতটির দিকে যাচ্ছেন : "খোদাতা'লা বলেন যে, এই কুরআন এবং রসূল উভয় একটি নূর।" এখন লক্ষ্য করুন যে, উর্দু ভাষার দিক দিয়ে বাক্যটি বাহ্যতঃ ত্রুটিযুক্ত বলে দেখা যায়। বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল, কুরআন আওর রসূল এক নূর হ্যাঁয়"। কিন্তু তিনি বলছেন : یہ قرآن اور رسول ایک نور ہے — যদ্বারা এই বুঝায় যে, উভয়ের মাঝে কোনও পার্থক্য করা যায় না। বস্তুতঃ কুরআনের নূরের মধ্যে ওরূপ কোন একটি দিকও নেই, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। অতএব, একই বস্তুর ভিন্ন আঙ্গিকে দুটি নাম মাত্র। এই নূরের একটি নাম হচ্ছে কুরআন করীম এবং অপরটি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ। অতএব তিনি 'ہے' শব্দটি প্রয়োগের দ্বারা উভয়কে একই বলে সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেছেন : "এই কুরআন এবং রসূল একটি নূর বটে, যা তোমাদের দিকে এসেছে। এই কিতাব প্রত্যেক সত্যকেই বর্ণনা করে। খোদাতা'লা ইহার দ্বারা সালামতি ও নিরাপত্তার পথ দেখান তাদেরকে, যারা খোদাতা'লার ইচ্ছার অনুসরণ করে। এবং তাদেরকে অন্ধকার-

রাশী থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। খোদাতে উপনীত করে, সেই সত্য-সরল পথ তাদেরকে দেখান। সে খোদা তিনিই, যিনি তার রসূলকে এই হেদায়াত এবং দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এই দীনকে সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করেন। হে মানব মণ্ডলী! কুরআন একটি প্রকাশ্য প্রমাণ যা খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তোমরা পেয়েছ। এবং একটি খোলাখুলি (উজ্জ্বল) নূর যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আজ তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করা হলো এবং নেয়ামত সম্পূর্ণ করা হলো।

উক্ত উদ্ধৃতিটি থেকে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, এর প্রথমে যে-একবচন ব্যবহার করা হয়েছে তাতে যেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নূর হিসেবে শামিল করা হয় নি বরং এর ইঙ্গিত পরবর্তী বর্ণনায় কেবল কুরআন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সন্দেহটির উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু এর বিপরীতে সুস্পষ্টতঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আরেকটি উদ্ধৃতি, যা আজ আমি আমার নোটস্-এর সাথে শামিল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম, যা এখানে দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে না, সে-উদ্ধৃতিটিতে এ আয়াতটির অথবা এরই অনুরূপ আয়াতমূলে কুরআন করীমকেও অবতীর্ণ নূর বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং সেই সাথে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকেও। মোটকথা, অকাট্যভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-কেও অবতীর্ণ নূর বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কুরআনকেও। তিনি উভয়ের উল্লেখের ক্ষেত্রেও একটিকে অপরটির সাথে এমনভাবে একীভূত করেছেন যে, বাহ্যতঃ কোথাও কেবল একটির উল্লেখ পরিলক্ষিত হলেও তিনি অন্যান্য আয়াতমূলে এ বিষয়ের স্পষ্টতঃ উন্মোচন করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লেখ ঐ সবগুণ ও বৈশিষ্ট্য সহকারেই রয়েছে, যা কুরআন করীমের উল্লেখের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

অতএব, তিনি বলেন, "তিনি সেই খোদা, যিনি তাঁর রসূলকে এই হেদায়াত এবং সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এই দীনকে সব দীনের উপর জয়যুক্ত করেন। হে মানবমণ্ডলী! কুরআন একটি প্রকাশ্য প্রমাণ, যা খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তোমরা পেয়েছো। (ইহা) একটি খোলাখুলি উজ্জ্বল নূর বটে, যা তোমাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে। আজ তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করা হলো এবং নেয়ামতসমূহকে সম্পূর্ণ করা হলো।"

এরপর বলেন: "খোদা এর দ্বারা সালামতি ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন তাদেরকে, যারা খোদাতা'লার ইচ্ছাকে অনুসরণ করে, এবং তাদেরকে অন্ধকাররাশী থেকে বের করে নূরের দিকে আনয়ন করেন এবং খোদা পর্যন্ত পৌঁছায় সেই সত্য সরল-পথ তাদের দেখান।"

এখন অবিকল এ কথাগুলোই আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি অন্ধকাররাশী থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন। অতঃপর, এখানে বর্ণিত কুরআন করীমের ঐ যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা আমি পুনরায় পাঠ করে

শুনালাম তা সবই আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম)-এরও বলে বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য আমার দৃষ্টিতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কুরআন করীম যখনই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ এবং কিতাবুল্লাহ্-র উল্লেখ করে, উভয়ের দিকে একটি সর্বনামের দ্বারা যখন ইঙ্গিত দান করে, তখন সে-সর্বনামটি উভয়কে নিজের আওতাভুক্ত করে।

এর আরেকটি প্রমাণ আমরা সূরা কাহ্‌ফের প্রথম আয়াত এবং সূরা 'তাহা'-এর মাঝামাঝিতে বর্ণিত আয়াতটি থেকে পাই। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا ۝

—একমাত্র সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি তাঁর বান্দার উপর এই পরিপূর্ণ কিতাব নাযেল করেছেন। এখন দুটির উল্লেখ একত্রিত হয়েছে—এক, বান্দা। দুই, কিতাব। এবং শেষে বলা হয়েছে ولم يجعل له عوجا (—উহার মধ্যে কোন বক্রতা রাখেন নি)। لهما (—উভয়ের মধ্যে) বলেন নি, বরং বলেছেন له, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যেই কোন বক্রতা রাখেন নি। সর্বনাম لهما নেই, বরং একবচন আছে বলে ধোঁকা খেয়ে বহু তফসীরকারক এবং অনুবাদক এর তরজমা করার সময় সর্বনামটিকে একটির দিকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং অধিকাংশ তরজমায় এই সর্বনামকে আপনারা কুরআনের দিকে আরোপিত হতে দেখবেন। কিন্তু যখন খোদাতা'লা বলেন: لم يجعل له عوجا (—তার মাঝে কোন বক্রতা রাখেন নি), তখন অনুবাদকদের মধ্যে কারও কারও মতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌কে বুঝানো হয়েছে, আবার কারও কারও মতে কুরআনকে। অধিকাংশ তফসীরকারক কুরআনের সপক্ষে অর্থ করেছেন যে, এতে কিতাবের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন তফসীরকারক এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, উক্ত সর্বনামটিতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ও শামিল এবং কুরআন করীমও। সূরা 'ত্বাহা'র যে আয়াতগুলোর দিকে আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম সেগুলোতে আল্লাহ্‌তা'লা স্পষ্টত: মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লেখ করে বলেন যে, يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له —অর্থাৎ যখন ঐ সব বড়ো বড়ো বিপ্লব সংঘটিত হবে—যখন পাহাড়গুলোকে পিষে দেয়া হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠকে সমতল করে দেয়া হবে, সেদিন ঐ সব বড়ো বড়ো শক্তির অধিকারী লোকেরা সবাই অবধারিতভাবে এই রসূলের পায়রবী করবে, যার মধ্যে নেই কোন বক্রতা। এবার দেখুন, لم يجعل له عوجا এবং لا عوج له উভয় একই বিষয়-বস্তুর দুটি বর্ণনা। এতটুকুও কোন পার্থক্য নেই। প্রথম আয়াতটি —যা সূরা 'কাহ্‌ফ' থেকে নেয়া হয়েছে, তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন: انزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا—তিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযেল করেছেন, (এবং) উহাতে কোন বক্রতা রাখেন নি। উহারই পরবর্তী সূরা ত্বাহা'য় বলেছেন, এই সমস্ত লোক সেদিন ঐ আহ্বানকারীকে অনুসরণ করবে, যাঁর মধ্যে কোন বক্রতা নেই।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, لاعوجا -এর বিষয়-বস্তু আবশ্যকীয়ভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র দিকে ইঙ্গিত করছে এবং তাতে প্রমাণ হয় যে, সূরা কাহ্‌ফেও তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু কিতাবের দিকেও ইঙ্গিত করছে, সেজন্য কিতাব অর্থ করাও সঠিক। কোথাও সর্বনাম শ্রেয়তঃ কিতাবের দিকে যায় বলে দেখা যায় এবং রসূলের দিকে ইঙ্গিত নিণিত হয়। কোথাও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দিকে স্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ দেখা যায় এবং উহাতে কুরআনও শামিল থাকে।

অতএব, কোনও পার্থক্য নেই কুরআনের নূর এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর নূরের মাঝে। **কুরআনের অনুশীলনমূলক জীবন্ত তফসীর বা ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)। কুরআনের আয়াতসমূহ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সীরাতের কোনও না কোন দিক আপনার সহায়ক সাব্যস্ত হবে। এবং যেখানে আপনাদের ব্যাখ্যা মুহাম্মদ রস‌ুলুল্লাহর নূর হতে বিচ্যুত বলে দেখা যাবে, সেখানেই ঐ ব্যাখ্যা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে! মুহাম্মদী নূরের সাথে উহার কোন সম্পর্ক থাকবে না।** আমার বলার অর্থ এ নয় যে, নিরঙ্কুশভাবে হাদীসাবলীর দ্বারাই বা হাদীসের সূত্র ধরেই তফসীর করা হোক। নিঃসন্দেহে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্তা এরূপ এক আলোকোজ্জ্বল নূর, যা সুস্পষ্টতঃ বোধগম্য, দ্ব্যর্থহীনভাবে কল্পনীয়। দৃষ্টান্তস্থলে যদি কোন হাদীস থেকে নির্ণয় করে নাউযুবিল্লাহ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে তাঁর শান ও মর্যাদা বিরোধী এরূপ কোন কথা বা কাজ আরোপিত হয়, যা কুরআন করীমের সেই নূরেরও পরিপন্থী হয় যাকে কুরআন করীম নিজেই সবচে' মর্যাদাশীল নূর হিসাবে সুস্পষ্টতঃ বর্ণনা করেছে, তাহলে ওরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে-হাদীস প্রকৃতপক্ষে হাদীস বলেই গণ্য হবে না। বস্তুতঃ উহা হাদীসের নামে অন্যদের (বানানো) হাদীস, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস নয়।

অতএব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, যেমন কুরআন করীম সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই তেমনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এরূপ এক নূর-স্বরূপ যে সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই— لاريب فيه ; এখন لاريب فيه -কে আমি অর্থগতভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর দিকেও আরোপ করছি এবং কুরআন করীমের দিকেও। এমনটি নয় যে, এ আয়াতটিতে (কোন একটিকে) নির্দিষ্ট করে কোন উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়াও কার্যতঃ আপনারা লক্ষ্য করুন যে, নূর হতে হেদায়াত লাভের জন্য শর্ত একটাই। আর তা হচ্ছে মুত্তাকী হওয়া لاريب فيه هدى للمتقين **মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর নূর হতে ফয়েয আহরণ** অর্থাৎ **তাঁর প্রকৃতি স্বভাব চরিত্র ও তাঁর উর্চ্চাঙ্গীণ মানবীয় গুণাবলী** এবং **তাঁর সীরাতকে হৃদয়ঙ্গম করা অবধারিত-**

ভাবে এক পবিত্রতাকে চায়।—যেখানেই পবিত্রতার ব্যত্যয় ঘটবে সেখানে একই বিষয়-বস্তু আপনাদের কাছে বিভিন্ন দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে পরিলক্ষিত হবে। সুতরাং বহু এমন মানুষও আছে যে, তারা যখন আলোর দিকে তাকায়, তখন তাতে তারা ভিন্ন রকম কিছু দেখতে পায়। কোন কোন লোকের দৃষ্টিতে সবুজ এবং লাল রং-ও কালো এবং সাদা দেখায়। আবার কারও দৃষ্টিতে গোলাপী দেখায়। কেউ আবার দুধের মত আবছা সাদা দেখে। কারও কাছে আবার উহাতে বিভিন্ন রকমের কালো দাগ পরিদৃষ্ট হয়, যেন ভূত-প্রেত নাচতে দেখা যায়। অতএব, এসবই দৈহিক তাকওয়ার অভাব (অর্থাৎ অসুস্থতা) থেকে দেখা দেয়। তাকওয়া আসলে সেই অভ্যন্তরীণ নূরকে বলা হয়, যা অবিকল তাই দেখে, যা বাস্তবতঃ বাইরে বিদ্যমান। এই অভ্যন্তরীণ নূরের মধ্যে যেখানেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবে, যেমন কিনা মানুষের দৃষ্টি-শক্তিতে খারাপির সৃষ্টি হলে সেখানে আবশ্যকীয়ভাবে 'রাইব' (ريب) দেখা দিবে। সন্দেহের উদ্রেক হবে যে, এই রং ছিল, না অন্য রং। এই চেহারা-আকৃতির লোক দেখে ছিল, না কী অন্য ধরনের। অতএব **কুরআন করীম এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিঃসন্দেহে একই নূরের দুটি আকার-আকৃতি। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্তা ও গুণাবলীতে গভীর চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতিতে যে সব তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়, মূলতঃ ওসবই কুরআনেরও তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য। একটিও কুরআন বহির্ভূত বিষয় তাঁর মাঝে দৃষ্টিগোচর হয় না বরং অবিকল কুরআন সম্মত।**

অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা নূরের কথা বলি বা বলবো, তখন স্মরণ রাখবেন যে, যেখানেই কুরআনের মাহাত্ম্যের বর্ণনা থাকে, সেখানে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ও সেটিতে শামিল থাকেন। যদি রসূলের আলোচনা থাকে, তাহলে কুরআন করীমও উহাতে শামিল বলে পরিদৃষ্ট হবে। অতএব, প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে প্রকাশ্য প্রমাণ এবং খুলাখুলি নূর নাযেল করা হয়েছে, তা সেই জীবন্ত প্রমাণ হিসাবে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহও ছিলেন এবং কুরআন করীমও। তেমনি এই নূর হিসাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূরও ছিল এবং কুরআন করীমের নূরও। এখানে নূর বলতে যদি শুধু কুরআনই হয় তাহলে সে-আয়াতটি কোথায় নিয়ে যাবেন? যেখানে مثل نوره বাক্যটিতে স্পষ্টতঃ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্রই উল্লেখ এক জীবন্ত সত্তা ও প্রকাশ্য নূর হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। অতএব, একই জায়গায় দুটি অর্থে মানুন অথবা বিভিন্ন জায়গায় একই অর্থকে পৃথক পৃথক রূপে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র অঙ্গুলি-হেলন একই দিকে নির্দেশ বহন করে, অথবা উভয় অঙ্গুলি একই দিকে ইঙ্গিত করবে অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কুরআন করীম উভয়ের দিকে।

কুরআন করীমকে হাব্‌লুল্লাহ্‌ (—আল্লাহ্‌র রজ্জু)-স্বরূপ মযবুতভাবে ধারণ করা যেমন জরুরী বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, তেমনি আঁ-হযরত (সাঃ)-কেও মযবুতভাবে হাবলুল্লাহ্‌-স্বরূপ ধারণ করা জরুরী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এক হিসেবে হাবলুল্লাহ হচ্ছে কুরআন। অন্য দিক দিয়ে হাব্‌লুল্লাহ্‌ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যেতে পারে না। কারও পক্ষে ইহা বলা সম্ভব নয় যে, কুরআনের উপর তো সে মযবুতভাবে হাত স্থাপন করে, কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে সে মযবুতভাবে ধারণ করে নি, বরং কোথাও কোথাও দুর্বলতা বা ত্রুটি রয়ে গেছে। অতএব, কুরআনকে ধরে রাখা যেমন জরুরী, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সীরাত ও আদর্শকেও ধরে রাখা তেমনই জরুরী। তবে কুরআনকে ধরা যেনো-তেনো প্রত্যেকের কাজও নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে গভীর উপলব্ধির প্রয়োজন। এক নূরের প্রয়োজন। সেই নূর ব্যতিরেকে আপনারা অবলোকন করতে পারেন না, সেই নূরকে, যা আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে নাযেল করা হয়েছে। বস্তুতঃ নূর দর্শনে অভাব ঘটে তাকওয়ার অভাবে।

এখন, উক্ত বিষয় দুটিকে একসাথে মিলিয়ে দেখুন। তাতে সে-হাদীসটির তাৎপর্য বোধগম্য হবে, যেখানে আঁ-হযরত (সাঃ) তাকওয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বার বার তাঁর বক্ষঃদেশ তথা অন্তঃকরণের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "তাকওয়া হচ্ছে এখানে, তাকওয়া হচ্ছে এখানে, তাকওয়া হচ্ছে এখানে।" **অন্তর্দৃষ্টির সেই পরিপূর্ণ নূর, যদ্বারা কুরআন করীমের প্রত্যেক হেদায়াতকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তা সর্বতোভাবে লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল একমাত্র হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এরই।** পক্ষান্তরে কারো দৃষ্টি-শক্তি দুর্বল থাকলে তাকে চক্ষুষ্মানের সাহায্য নিতে হয়। খালি লাঠির ভরে তো জীবন চলে না। লাঠি দিয়ে হাতড়িয়ে অন্ধ চলে। তবুও হোঁচটই খায়। বরং দেখা যায় লাঠির চে'ও শ্রেয়ঃ হচ্ছে ঐ সব কুকুর যারা কিছু হলেও তো দেখতে পায়। আর তাই ওরা নিজেদের প্রভুকে সর্বদা আশংকাবলী থেকে রক্ষা করে চলে। বস্তুতঃ যাঁকে অন্তর্দৃষ্টির পরিপূর্ণ নূর দান করা হয়েছে, তার হাতে যদি হাত দেয়া হয়, তাহলে তারা নিজেদের দৃষ্টির সব রকম খারাপি থেকে রক্ষা পেয়ে নিজেদের নফ্‌সের সব রকম অনিষ্টকে পাশ কাটিয়ে তা থেকে আত্মরক্ষা করে পদে-পদে সঠিক হেদায়াতের দিকে চলার তওফীক পেতে পারে। এবং সে-অর্থেই আঁ-হযরত (সাঃ) হচ্ছেন ওসীলা। সে-অর্থেই আলোচ্য আয়াতগুলোতে সবশেষে সিরাতে-মুস্তাকীমে পৌঁছার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন পুনরায় আপনারা যদি এতদ্‌সংক্রান্ত খোৎবাসমূহ শ্রবণ করেন, তাহলে এ-বিষয়টি আপনাদের উপর স্পষ্টতঃ উন্মোচিত হবে। يايها الناس قدجاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ০ —হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের কাছে এক প্রকাশ্য প্রমাণ

উপস্থিত হয়েছে—এতো উজ্জ্বল প্রমাণ, যা সিদ্দীকগণেরই দৃষ্টিগোচর হয়। তারাই জানেন যে, এরচে' বড়ো আর কোন প্রমাণ নেই। এই প্রমাণ সম্পর্কেই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

اگر خواهی دلیلے عاشقش باش
محمد هست برهان محمد

—যদি প্রমাণ খোঁজো, তাহলে প্রেমিকে পরিণত হও, কেননা যে 'বুরহান' বা প্রকাশ্য প্রমাণের আয়াতটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্-ই বটেন। তাঁর চেয়ে শ্রেয়তর আর কোন প্রমাণ নেই। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এখানে এ কথা বলেন নি যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও তাহলে প্রথমে কুরআন বুঝো। কেননা, কুরআনকে বুঝার মত সবার তওফীক কোথায়? কুরআনকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে নূরের সাহায্যে, সে নূরই বা কোথায়? তবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হচ্ছেন এরূপ (খোলাখুলি) উজ্জ্বল নূর, যাকে দূর দূর থেকে দেখা যায়। কিন্তু সে-জন্যও কিছু অভ্যন্তরীণ সত্যতা ও সাধুতা আবশ্যকীয়। এবং এই নূর কুরআনের মোকাবেলায় মানবাকারে হওয়ার দরুন অধিকতর প্রকাশমান, অধিকতর বোধগম্য। কেননা, ইহা মানবীয় স্বভাব-চরিত্রকে দেখাবার ও বুঝাবার ক্ষেত্রে মানুষের সহায়ক। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাকওয়ার শর্ত বিদ্যমান। কিন্তু সেই তাকওয়া নয়, যা জ্ঞান দান করে। সে-তাকওয়া ভিন্নতর। এক প্রকার তাকওয়া হচ্ছে যা সত্য যেখানেই সে দেখতে পায় তৎক্ষণাৎ তা চিনতে সক্ষম হয়।

সুতরাং, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে প্রকাশ্য প্রমাণ হিসাবে উপলব্ধি করার সবচে' মহান দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমান আনয়ন। যখন আঁ হযরত (সাঃ) দাবী করেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, বরং কোন সফরে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে আসলেন, তখন তাঁর কৃতদাসী গৃহপরিচারিকা এই ভেবে যে, অত্যন্ত গভীর বন্ধু ছিলেন, যদি জানতে পারেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্—রসূলুল্লাহ্ শব্দটি অবশ্য সে ভাবে নি, সে তো মুশরেকা ছিল, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে সে চিন্তা করলো যে, এই মোহাম্মদ ব্যক্তিটি কেমন, কী হয়ে গেলেন তিনি, কী সব কথা বলছেন, তাতে আবু বকর গভীরভাবে মর্মাহত হবেন, সেজন্য কারো কাছে কেউ যেমন অত্যন্ত খারাপ সংবাদ দিতে গিয়ে তার হৃদয়ে স্বস্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে বর্ণনা করে তদ্রূপ সে বলতে আরম্ভ করলো, 'আহা, বেচারা মুহাম্মদ! তাঁর কী ঘটলো যে, তিনি এমন হয়ে গেলেন!' খোলাসা করে না বলে, সে ইঙ্গিত ইশারা করছিল। তাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত অস্থির বোধ করতে লাগলেন, 'কী হয়েছে, কী ঘটনা ঘটেছে, আমাকে বলো।' তখন তাকে খুলেই বলতে হলো, "তিনি তো দাবী করে বসেছেন যে, তাঁর উপর খোদা অবতীর্ণ হন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন, তাঁকে এই যুগে রসূলস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।" এসব কথা সে জানালো। শুনামাত্র সব কাজ ছেড়ে তৎক্ষণাৎ তিনি সোজা হুযূর আকরাম (সাঃ)-

এর খিদমতে হাযির হলেন। বললেন, "হে মুহাম্মদ! আপনার সম্পর্কে এই সব কথা বলা হচ্ছে, আপনি কী ওরূপ দাবী করেছেন?" তাঁ হযরত (সাঃ)-এরও অনুরূপ চিন্তায় ধরলো যে, তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু, যদি আচমকা তাকে বলে দেন, তাতে পাছে তিনি পদস্খলিত হন। তাই তিনি বললেন, "শোন আবু বকর! এই ব্যাপার, তার এই দলিল-প্রমাণ।" এভাবে তিনি কথা শুরু করলেন। তাতে আবু বকর বললেন, "আমি তো, কী দলিল-প্রমাণ তা জিজ্ঞেস করি নি। আমি জানতে চাচ্ছি, আপনি দাবী করেছেন, কি, না।" রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঐ কথা শুনে বললেন, "হ্যাঁ, আমি দাবী করেছি।" আবু বকর বললেন, "যদি দাবী করে থাকেন, তাহলে আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, আপনি সত্যবাদী। আজই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, "যা আপনার সাক্ষ্য, তাই আমারও সাক্ষ্য।" ভাষা তাই না হোক, ভিন্নতর হোক, কিন্তু বিষয়-বস্তু অবিকল এই ছিল। এ হচ্ছে সিদ্দিকীয়াত যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র চেহারাকে তিনি প্রকাশ্য প্রমাণ হিসেবে আগেই দেখছিলেন এবং জানতেন যে, তাঁর সত্যতার এর চে' বড়ো প্রমাণ অন্য কিছু হতেই পারে না। কিন্তু এর জন্য যে-নূরের প্রয়োজন, জরুরী নয় যে, সে-নূর কুরআন অধ্যয়নেও অনুরূপ বিস্ময়কর ক্রিয়া দেখায়।

বস্তুতঃ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র সত্যতা সনাক্ত করা সত্ত্বেও **কুরআনকে সবিস্তারে জানার জন্যে যে নূরের প্রয়োজন, তা সর্বাধিক পরিমাণে ও সবচে' পরিপূর্ণরূপে** দান **করা হয়েছিল হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্কে**। অতঃপর তাদেরকে দান করা হয়, যাঁদেরকে খোদাতা'লা যতোটা ইচ্ছা অন্তর্দৃষ্টির নূর দান করেন এবং নিজে উহার হিফাযত করেন। স্মরণ রাখবেন যে, অন্তর্দৃষ্টির নূর প্রদত্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়; স্বয়ং উহার হিফাযতও আবশ্যকীয় এবং উহাকে সঠিক পথে পরিচালিত রাখার জন্য আধ্যাত্মিক জগতে নির্ধারিত সংরক্ষণ-ব্যবস্থাকে কার্যকররূপে নিয়োজিত রাখা আবশ্যকীয় সে বান্দার ক্ষেত্রে, যাকে আল্লাহ্ কুরআনের কিছু নূর দেখাতে চান, যাতে সেই ভুল করে না দেখে, এই লক্ষ্যে যেন তার হিফাযত করা হয়। ইহা এজন্য স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন বাস্তব সত্য যে, যেখানে কুরআনের হিফাযতের ওয়াদা রয়েছে, সেখানে উক্ত ব্যবস্থার ওয়াদাটিও উহারই অন্তর্ভুক্ত বটে। এতদ্ব্যতিরেকে সে-ওয়াদা পরিপূর্ণ হতে পারে না। অতএব, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে এই যুগে যখন নূরে-ফোরকান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পয়দা করা হলো, তখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র সত্তাকে সনাক্ত করার এবং তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা হওয়ার লক্ষ্যে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির নূর যেমন পূর্ণতার মাত্রায় উপনীত হয়েছিল, তেমনি সে-অন্তর্দৃষ্টির নূর পবিত্র কুরআনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রেও পূর্ণতার মাত্রায় উপনীত হয়। বস্তুতঃ সে-দিক দিয়ে অভ্যন্তরীণ নূরের বিভিন্ন বিকাশস্থলদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব একটি

হচ্ছে সেই নূর, যা সত্যকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়—সত্যবাদীর চেহারা অবলোকন করা মাত্র সাক্ষ্য দান করে। এ বাদে অন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন বাকী থাকে না। আরেক নূর হচ্ছে, যা এতো উজ্জ্বল হয়ে উঠে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র নূরের মাঝে এতো নিমজ্জিত হয়, এতো গভীরে নেমে যায় যে, সে যখন কুরআন পাঠ করে তখন কুরআনের গোপন তত্ত্ব ও রহস্যাবলীও তার কাছে স্পষ্টতঃ উন্মোচিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু **ওহী-ইলাহী বা ঐশীবাণীর এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র নূরের মাঝে কোন পার্থক্য থাকলে সেটি হচ্ছে এই যে ঐশীবাণীর নূর চিরন্তনরূপে উহার অন্তর্নিহিত অর্থাবলীর উপর চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দিতে থাকে। প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ও-সব অর্থ উহাতে পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র নূরের মধ্যে ঐসব অর্থ ওরূপে উপলুব্ধ হয় না—ইহা ব্যতিরেকে যে কুরআনের সূত্রে তিনি (সাঃ) যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেন সেগুলোর দরুন অর্থাবলীও পরিদৃষ্ট হতে আরম্ভ করে। তখন এতদোভয় একে অন্যের দর্পণস্বরূপ হয়ে যায়।** ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ স্বভাবতঃ সরাসরি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র সত্তায় বিদ্যমান নয়; মূলতঃ কুরআন করীমে বিদ্যমান। ভবিষ্যতকালের সংবাদসমূহ এবং অবস্থাবলীর নির্ণয়প্রণালী কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। তদনুযায়ী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্তর্দৃষ্টির নূর সেগুলোকে প্রত্যক্ষ ও হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাছাড়া কুরআন ব্যতীত আরও ওহী তাঁর উপর নাযেল হয়েছে এবং ওহীর সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁর নিকটও ঐ সব বিষয় সেরূপে পরিদৃষ্ট হয় নি যেরূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তারপর আমাদেরকে দেখিয়েছেন।

অতএব, আমরা যে বলি, কিতাব ও রসূল একই জিনিষের দু'টি নাম, বস্তুতঃ ইহা একটি বাচনভঙ্গী। আক্ষরিক অর্থে উভয় যেন সম্পূর্ণ একই বস্তু, ওরূপে ইহার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে রূপকাশ্রিত বিষয়াবলীর উন্নত ও উত্তম যে-সব দিক যুক্তিযুক্তভাবে একটি আরেকটির উপর যতটুকু প্রয়োজ্য হতে পারে ততোটুকুই রূপকতার বিষয় সাব্যস্ত হয়। নচেৎ, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তো, কোরআন যেভাবে লিখিত হয়, সেভাবে ক'রে লিখা যায় না। বস্তুতঃ কোরআন করীমের বহুবিধ বিষয় রয়েছে। কুরআন করীম ধীরে-ধীরে স্তরে-স্তরে ওহীর আকারে নাযেল হয়েছে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূর সম্পর্কে ইহাও বর্ণিত হয়েছে যে, উহাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়। তারপর যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন স্বভাবজাত যাবতীয় নূরানী গুণ ও বৈশিষ্ট্য যদিও তাঁর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরআন অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সে-সব দিক দিয়ে "নুরুন আলা নূর"-এ পরিণত হতে পারেন নি। প্রত্যেকটি ওহী তাঁর এক একটি নূরের উপর জ্যোতির্বিকাশ ঘটায়। অতঃপর, সেখানে সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। তারপর

আমরা বলতে পারি যে, সেই নূর যা কুরআনে নিহিত, সে-নূর হচ্ছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। আর এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লেগেছে ২৩ বছর কাল।

কিন্তু নূরের এই আলোকসম্পাত, বিগত খোৎবায় যেমন বর্ণনা করেছি হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর তিরোধানের পরও সদা অব্যাহত রয়েছে, চিরকাল থাকবে। আর সে-নূরেরই পায়রবীতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর চিত্র এক সুন্দর মনোরম আকৃতির রূপ ধারণ করে উদ্ভাসিত হয় এই যুগে। কিন্তু এই উভয়ের মাঝে পার্থ্যক্যের জায়গায় পার্থ্যক্য রয়েছে। সাদৃশ্যের জায়গায় সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু প্রথমত্বের মহিমা সগৌরবে স্বস্থানেই বিদ্যমান। **মসীহ মাওউদ (আঃ) যা কিছু নূর পেয়েছেন তা সবই পেয়েছেন কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক সূত্র ব্যতিরেকে তিনি কুরআন করীমের কোনও নূর লাভ করতে পারতেন না।** হেদায়াতের এতোটুকুও আহরণ করতে পারতেন না, যদি এই অঙ্গণে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর নিঃস্পৃহতা থাকতো, মুখাপেক্ষিতার অনুভূতির অভাব হতো এবং কার্যতঃ তাঁর কাছেই ফায়েদা গ্রহণে তিনি ব্যাপৃত না হতেন। অতএব কুরআন করীম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কী সম্পর্ক ছিলো, সে-প্রসঙ্গে এই যাবতীয় শর্তাবলীকে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যকীয়। অতএব তিনি যে নূর দর্শন করেন এবং আমাদেরকে দর্শন করান, তা তাঁর গ্রন্থাবলীতে এরূপ দেদীপ্যমান হয়ে আছে যে, হতবাক হতে হয় এই বলে যে, এক ব্যক্তি আজীবন এতো কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এতো মহান জ্ঞানতত্ত্ব কীরূপে বর্ণনা করলেন? কীভাবে উদঘাটন করলেন? কী করে সময় সংকুলান করলেন? অতঃপর এতো অল্প সময়ে এই অজস্র জ্ঞানরাশী কীরূপে তিনি একত্রিত আকারে এক মহাসিন্ধুকে বিন্দুতে আবদ্ধ করলেন? এখন এসবের উপর প্রয়োজন সদা গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে ভিতরে প্রবেশ করে সযত্নে যদি আপনারা সফর করেন, তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী থেকে আপনারা উপকৃত হতে পারেন। নইলে অনেক সময় ধোঁকাও লেগে যায়। তাঁর কোন কোন রচনা থেকে কোন সময় কোন আহমদী এমনও মনে করেন যে, এখানে যেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্য-দৃষ্টিতে খোদার দর্শন লাভ করেছেন বলে উল্লেখ আছে। অথচ বাহ্যিকরূপে খোদা-তা'লার দর্শন লাভের কোন ভিত্তি নেই। ওরূপ হতেই পারে না। পারা অসম্ভব। কথনও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাহ্যিকভাবে খোদা-দর্শনের কোথাও উল্লেখ নেই। কিন্তু ইহা একটি স্বতন্ত্র বিষয়-বস্তু। আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোন কোন উদ্ধৃতি থেকে এ ধরনের সন্দেহ-সংশয়েরও উদ্রেক হয়। আপনারা পড়ুন এবং বার বার পড়ুন। তাতে আসলে কী ছিল তা বোধগম্য হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, অনুরূপ একটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি : (বাংলায় উহার ভাবার্থ হচ্ছেঃ)

মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

—বিনীত বান্দা ইমরানের পুত্র মূসা (আঃ)-এর সম্বিত হারিয়ে ভূপাতিত হওয়া একটি রূহানী ঘটনা ছিল, যার কারণ কোন দৈহিক বা জাগতিক আঁধার ছিল না, বরং ঐশী গুণাবলীর যে চরম জ্যোতির্বিকাশ ঘটেছিল উহাই এর কারণ ছিল।"

এখন, এই বিষয়-বস্তুটি ভালো উর্দু জানা ব্যক্তিও পড়া বা শুনামাত্র বুঝতে পারবেন না। কেননা, ভাষা তো উর্দুই বটে কিন্তু অতি উচ্চ স্তরের উর্দু। এতে আরবী ভাষার বিষয়-বস্তু সংক্রান্ত সব শব্দই শামিল করা হয়েছে, আর তা করা একটি বাধ্যবাধকতা বটে। কেননা, স্বল্পপরিসরে যখন প্রচুর বিষয়-বস্তু বেঁধে দিতে হয়, তখন কিছু কঠিন পথ বেয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাই তিনি সতর্কতামূলকভাবে তাগিদও দিয়েছেন এই বলে যে, দেখ, তোমরা মাত্র একবারই পড়েছো বলে মনে করে বসবে না যে, তোমরা সেরে ফেলেছো। তোমাদেরকে বার বার পড়তে হবে। যদি মনে কর যে, তোমরা একবার পাঠ করেই সব কিছু পেয়ে যাবে, তাহলে এটা এক প্রকার অহংকার। সুতরাং কোন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত অস্থির হয়ে লিখেন যে, তারা এ যাবৎ একবারও পাঠ করতে পারেন নি। যদি আজ মারা যান, তবে কি তারা অহঙ্কারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করবেন? তাদেরকে আমি বুঝাই যে, তোমরা বিষয়টি বুঝতে পারছো না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কোন কোন আলেম-উলামা যেমন মনে করেন যে, তাদের একবারও পড়ার কী বা প্রয়োজন। কেউ মনে করেন যে, একবার পড়ে নিলেই যথেষ্ট। বস্তুতঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, হুঁশিয়ার করছেন (বিশেষতঃ তাদেরকে) এই বলে যে, তিনি জ্ঞান-ভাণ্ডার বিলিয়েছেন। এর মাঝে এতো গভীর বিষয়-বস্তু এতো স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করেছেন যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তো দূরে থাক, উলামাও যতক্ষণ পর্যন্ত না অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিনয়ের সাথে বার বার পড়েন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত বিষয় বা উদ্দেশ্য উদ্ধার করতে পারবেন না।

এ কথাটি বলেছেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যিনি হচ্ছেন খোদাতা'লার পক্ষ থেকে নূর-প্রাপ্ত। দুনিয়াতে সাধারণ অবস্থায় এরূপ কবিরাও ওরকম কথা বলে থাকেন, যারা নিজেরা কিছুটা জটিল ও কঠিন হওয়ার বিষয়ে সচেতন। কবি গালেব বলেছেন :

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے
مدعا عنقا ہے اپنے عالم تحریر کا
অথবা عالم تقریر کا

গালেব বলেন যে, হুঁশ এবং মনোযোগ সহকারে শুনো এবং বুঝবার চেষ্টা করো। কিন্তু শ্রবণের যত ইচ্ছা জাল ফাঁদে না কেন, আমার লিখা বা বক্তব্য-জগতের উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্থ 'উনকা' পাখির ন্যায় ঐ জালে ধরা পড়বে না, যেমন কল্পিত অদৃশ্য 'উনকা'

পাখি জালে ধরা পড়ে না, কিন্তু তবুও যদি আমার বক্তব্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পার, তাহলে এই অদৃশ্য কল্পিত পাখির সম্পর্কে যেমন কথিত আছে যে, উহার ছায়া যদি কারো মাথার উপর কখনও পড়ে তাহলে সে বাদশা হয়ে যায়, তেমনি আমার প্রকৃত বক্তব্য যদি তোমরা বুঝতে পার, তাহলে ধন্য হয়ে যাবে।" (ভাবার্থ)। দেখুন, এ-তো হচ্ছে এক চরম অতিশয়োক্তি। নবীগণ তো ওরূপ অতিশয়োক্তি করেন না। কিন্তু যারা জানেন যে, তারা সচেতনভাবে অনেক গভীর ও বিশাল বিষয়-বস্তু তাদের রচনার অল্প পরিসরে আনয়ন করতে চান, কিন্তু অতি কষ্টে তা বর্ণনা করতে পেরেছেন, ও'রাও একটা অনুভূতি রাখেন যে, যেনতেন প্রত্যেকে সে বিষয়-বস্তু অনায়াশে বুঝে উঠতে পারবে না। কিন্তু বিষয়-বস্তু কঠিন হওয়াতে উহার মর্যাদা হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। অতএব, আমি আপনাদেরকে মানব-প্রকৃতির ধারা জানাচ্ছি যে, তাঁরা ওভাবেও কথা বলে থাকেন। যাঁরা কঠিন দুর্বোধ্য কথা-বার্তা লিখতে বাধ্য হন। তাঁরা মনোযোগ অবশ্যই আকর্ষণ করেন এই বলে যে, অত্যন্ত দামি কথা বটে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তো আল্লাহ্ থেকে নূর-প্রাপ্ত ছিলেন। সেজন্য নূরের কাজ হলো, উচুঁ নীচু সম্বন্ধে অবহিত করা, সতর্ক করা, প্রত্যেক হোঁচটের আগেই হুঁশিয়ার করা। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তিন বারের কথা বলেছেন। অসম্ভব নয় যে, এমন বহু লোক আছেন, যারা তিনবার পড়েও বুঝতে পারেন না। কিন্তু এই দোয়া তো করা উচিত যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণিত গুঢ়তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করার উপযোগী নূর যেন আল্লাহ্ তাদের দান করেন। কেননা, ঐসব জ্ঞান-তত্ত্ব হচ্ছে কুরআনেরই জ্ঞান-তত্ত্ব। ওসব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জ্ঞান-তত্ত্ব।

অতএব, তিনি যে বলেছেন, "দৈহিক আঁধার ছিল না, উহা ছিল এক রূহানী ঘটনা। কোন দৈহিক আঁধার উহা ঘটাবার কারণ হয় নি।" এর দ্বারা বুঝায় এই যে, মূসার অস্তিত্বের মাঝে দৈহিক আঁধার এমন কোনও ছিল না, যার ফলশ্রুতিতে ঐশী-জ্যোতিবিকাশ দর্শনে তিনি বঞ্চিত হন। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা বা অভিজ্ঞান। অর্থাৎ, 'ইনসানে-কামিল' তথা পূর্ণমানবের (সাঃ) জন্যে ঐশী-গুণাবলীর যে সব জ্যোতিবিকাশ নির্ধারিত ছিল, উহা সহ্য করবার মত শক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর ছিল না। ইহাই তাঁর বলার উদ্দেশ্য।

সুতরাং তিনি বলেন,

تجلیات صفات الٰہیہ جو بغایت اشراق نور ظہور میں آئی تھی

'ইশ্‌রাকে-নূর' মানে নূর যখন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটাকে বলা হয় 'ইশরাক'। বাগাইয়াত (بغایت) মানে ঐ চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত, যেখানে নূর সহসা

প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং চার দিক সমস্ত পরিবেশকে আলোকিত করে তোলে। এরূপ নূর, যা অসাধারণ শক্তিতে উৎসারিত হয় সেই জ্যোতির্বিকাশকে ঐসব লোক দেখতে পারেন না, যাদের দৃষ্টি-শক্তি সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের নূরের চূড়ান্ত জ্যোতির্বিকাশকে দেখার মত ক্ষমতা রাখে না। তা দেখার মত পরিপূর্ণ শক্তি কেবল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) জন্যই নির্ধারিত ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যা বর্ণনা করেছেন তদ্বারা ইহাই বুঝায়। কেননা, মূসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে সবদিকে ঐ নূর বিস্তৃত তো হয়ে ছিল কিন্তু সব দিকে যাওয়ার মত তাঁর সে দৃষ্টি ছিল না বলে উহা ধারণ করতে পারেন নি।

অতঃপর তিনি বলেন,

"ظہور میں آئی تھی، وہ اسکا موجب اور باعث تھی"

অর্থাৎ ঐ তীব্র জ্যোতির্বিকাশ নিজেই দৃষ্টির পক্ষে পর্দা ও আবরণ হয়ে দাঁড়ালো। বস্তুতঃপক্ষে হঠাৎ যখন কোন আলো অসাধারণ তীব্রতা দেখায়, তখন চোখ ঝলসে যায় এবং অন্ধপ্রায় হয়ে পড়ে। অতএব মূলতঃ অভ্যন্তরীণ কোন রূহানী ত্রুটির কারণে ওরূপ ঘটে নি অথবা কোন শারীরিক দুর্বলতার দরুনও ঘটে নি। বরং উহা এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান ছিল যা তাঁর রূহানী ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত ব্যাপার ছিল। এ সেই বিষয়, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, কিন্তু কতো সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন যে, বলছেন: ঐশী গুণাবলীর পূর্ণ আলোকসম্পাতের দরুন বিনীত বান্দা এমরানের পুত্র বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন'—বিনীত বান্দা এম্রানের পুত্রের পক্ষে সহ্য করার মত কোথায় সে-ক্ষমতা ছিল যাতে তিনি সে-জলওয়া দেখতে পারতেন, যা ছিল পূর্ণ আলোক-সম্পাত বিশিষ্ট এক জলওয়া।

অতঃপর বলেন:

"اور اگر عنایت الہیہ اسکا تدارک نہ کرتی تو اسی حالت میں گداز ہو کر
نابود ہو جاتا"

—"যদি ঐশী-কৃপা তাঁর সে অবস্থার প্রতিকার না করতো, তাহলে সে-অবস্থায় তিনি আত্মবিলীন হয়ে নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলতেন।" চিত্তবিগলিত সে-অবস্থায় তিনি অনস্তিত্বে মিশে যেতেন। نابود শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, যা ছিল তা না থাকা—এমন হয়ে যাওয়া, যেন ছিলই না।

এখন লক্ষ্য করুন, উল্লেখিত অবস্থাটি হচ্ছে নূরের পর্দার আলোকসম্পাতের সাথে সম্পৃক্ত। খোদাতা'লার স্বীয় সত্ত্বার যে নূর, সে-নূরের পর্দার মধ্যে আসল নূর হিসেবে যে তিনি লুক্কায়িত আছেন, তার সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেন চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেছিলেন, কোথাও ইহার ইশারা-ইঙ্গিতেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যা দেখেছেন তা হচ্ছে সে আসল

ঐশী নূরের আলোকসম্পাতস্বরূপ নূর। সে-নূরেরই উল্লেখ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) করেছেন এবং ইহাও জানিয়েছেন যে, এ-সব হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আবরণস্বরূপ নূর। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এরই ব্যাখ্যায় হযরত সুলায়মান ও সাবার রাণী সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করে স্পষ্টতঃ বলেছেন যে, আসল ঐশী নূরকে তো কেউ-ই কোনভাবেও দেখার ক্ষমতা রাখে না। সাধারণ দুনিয়ার বস্তুগুলোতেই যখন আমরা খোদাতা'লার বিভিন্নগুণের জ্যোতির্বিকাশ প্রত্যক্ষ করি, তখন যা পরিলক্ষিত হয়, আমরা ওটাকেই খোদা বলে মনে করতে আরম্ভ করি। ইহা ভুল। আসল নূর হচ্ছে উহার পিছনে, যার ক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণে দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুতে তার ঝিলিক দেখা যায়। তাঁর থেকেই উহার উদ্ভব হয়।

মোট কথা, এ বিষয়-বস্তুটিতে একটু সম্মুখে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন: "কিন্তু এ মর্তবাটি পরিপূর্ণ রূহানী উন্নতিসমূহের চূড়ান্ত মর্তবা নয়।" হযরত মূসা (আঃ)-কে দেওয়া ঐ মর্তবা এবং এরই সদৃশ মর্তবাসমূহ—এসবই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতিসমূহের চূড়ান্ত মার্গ নয়। সে চূড়ান্ত মার্গটি হচ্ছে উহা, যার সম্পর্কে লিখা আছে مازاغ البصر وما طغی —যে, দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয় নি এবং তার কাছে যা পরিদৃষ্ট হলো উহাতে কোনও রকমের বক্রতা দেখায় নি।" এতটুকু অংশ পাঠ করার পর মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, নূরের যে-সব জ্যোতির্বিকাশের উল্লেখ করা হয়েছিল, তা ছিল সর্ব সাধারণের বা তাদের মধ্যে উন্নততর বিকাশস্থল নবীগণের জন্য আল্লাহ-দর্শনস্বরূপ নির্ধারিত স্তর। সে পর্যন্ত উন্নতি লাভ করাই তাদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উহাকেও ছাড়িয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতেও যেন খোদাকে দেখেছিলেন। এরূপ অর্থ করা সঠিক নয়। কেননা, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এরই সাথে পরেও কিছু লিখেছেন। তিনি বলেন: (ভাবার্থঃ)

"মানুষ তার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ অতিক্রমকালে নিজের কাশ্‌ফি বা দিব্য-দর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলোতে অনেক কিছু বিস্ময়কর বিষয় প্রত্যক্ষ করে থাকে এবং তার উপর বিভিন্ন ধরনের বিশেষ রূহানী অবস্থার অবতারণা ঘটে। কিন্তু এর সবচে' উন্নত স্তরটি হচ্ছে উবুদীয়্যতের মাকাম,

جس کا لازمہ صحو اور ہوشیاری ہے اور سکر اور شطح سے بکلی بیزاری ہے

অর্থাৎ—যার অবধারিত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তদবস্থায় বিরাজ করে পরিপূর্ণ চৈতন্য, বিচক্ষণতা ও একাগ্রচিত্ততা। তাতে লেশমাত্রও থাকে না জ্ঞানহারা নেশাগ্রস্থতা বা নিদ্রাচ্ছন্নতা-ভাব।" (মকতুবাতে আহমদ বনাম মীর আব্বাস আলী লুধিয়ানভী)

এখানে বর্ণিত এ বিষয়-বস্তুর কেবল সার সংক্ষেপইএখন আমি বর্ণনা করতে পারি। তিনি যা বুঝিয়েছেন তা হচ্ছে যে, মানুষ যখন খোদার দর্শন লাভ করে, তখন উহা হয়ে থাকে

কাশফী অবস্থা। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কাশফী অবস্থায় দুই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ হতে দেখা যায়। আব্বাস আলী শাহ্, যিনি পরে মুর্তাদ হয়ে যান, শুরুতে তার যে বিষয়াবলীর সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ এবং গভীর তত্ত্বানুসন্ধানের স্পৃহা এমন ধরনের ছিল যে, তাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মনে তার সম্পর্কে কিছু নেক প্রত্যাশার উদয় হয়েছিল, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, তিনি পরে পার্থিবতার দিকে ঝুঁকে যান এবং ঐসব গুণের দ্বারা তিনি উপকৃত হতে পারেননি, যা তার 'রাফা' বা আত্মিক উন্নতির কারণ হতে পারতো। সেজন্য উক্ত আব্বাস আলীর উল্লেখ করতে গিয়ে আপনাদেরকে আমার জানানো উচিত যে, এই হচ্ছে এর পটভূমি। তিনি এক চিঠিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঐ সব লোক যারা সূফী সাধক ব্যক্তি এবং যারা নিজেদের অন্তরাত্মায় ডুব দিয়ে, খোদাতা'লার পবিত্র গুণাবলীতে গভীর চিন্তা-ভাবনায় মনোনিবেশ করেন, তাদের উপর এক আবেশ ও তন্ময়তার সৃষ্টি হয় এবং তাদের ভেতর আসে এক ধরনের নিদ্রা বা তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভাব। কিন্তু কুরআন করীম বলে যে, যদি তোমরা নিদ্রাচ্ছন্নতা অনুভব কর, তাহলে নামাযের কাছেও যেয়ো না। অতএব, এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বা বিরোধ কী? এ সেই বিষয়-বস্তু, যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করেন। বিষয়টির সারসংক্ষেপ হচ্ছে, তিনি বলেন যে, নূরের আলোকসম্পাতে যে তন্ময়তা ও আবেশের সৃষ্টি হয় তা উবুদীয়্যত থেকে হয় এবং এতদ্ব্যতিরেকে যে তন্দ্রাভাব হয় সেটা হচ্ছে দুনিয়াদারী এবং মৃতের ন্যায় অচেতন অবস্থা। এর কোন মূল্য নেই। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে দেখতে হবে যে, নিদ্রাসুলভ নেশা অথবা যাকে তন্ময়তা বলা হয় তা কী কারণে হয়েছে। তা কী খোদাতা'লার নৈকট্যলাভ এবং তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে হয়েছে, না কী দুনিয়াদারীর ফলশ্রুতিতে। যদি জাগতিকতার ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে, তাহলে উহা নিছক মৃত্যুতুল্য। এমতাবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটেও যেয়ো না। যদি উহা এ কারণে হয়ে থাকে যে, খোদার প্রেমে ডুবে গিয়ে উহার আস্বাদে আত্মহারা হয়েছো, তাহলে সে আবেশ ও তন্ময়তা ভিন্ন ধরনের জিনিষ। সে অবস্থায় তো মানুষের আত্মিক দৃষ্টি আরও প্রখর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সে অবস্থাতেই সে আল্লাহ্র জলওয়া অবলোকন করতে পারে এবং দীদারে-ইলাহী (খোদা-দর্শন)-এর তওফীক পায়, যা লাভ করার, সাধারণ মানুষের সুযোগ ঘটে না। এবং এর সম্পর্ক উবুদীয়্যতের সাথে যুক্ত, অহংকারের সাথে নয়।

অতএব, অহঙ্কারপন্থীরাও এক গাফলত বা অচেতন অবস্থার মধ্যে থাকে এবং বিনয়পন্থীরাও এক ধরনের গাফলত বা অচেতন অবস্থার মাঝে ডুবে যায়, কিন্তু সে গাফলত তাদেরকে দুনিয়া থেকে গাফিল (বা অমনোযোগী) করে এবং আল্লাহ্র জন্য তাদের অনু-

ভূতিকে উজ্জলতর করে। সে-অবস্থায় নামায থেকে নিষেধ করা হয় নি। বরং ওটাই তো নামাযের উদ্দেশ্য। অতএব, এই হচ্ছে এ বিষয়-বিস্তুটির সারবত্তা। হুশিয়ারী এবং চালাকিও দুই প্রকারের জিনিষ, তেমনি সচেনতা এবং বেহুশীও। এতদোভয়ের মাঝে এরূপ সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য নির্ণয় ক'রে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) উক্ত চিঠিতে দেখিয়েছেন—পরিশেষে এই ফল নির্ধারণ করেছেন যে, উবুদীয়্যত থেকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় উহার সবচে' উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মাকামটি হচ্ছে যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দান করা হয়েছিল এবং পরিপূর্ণ উবুদীয়্যতের ফলশ্রুতিতেই তিনি উহা অবলোকন করেছিলেন, যা আর কেউ করতে পারতো না. কিন্তু মানবীয় গণ্ডীর ভিতরে অবস্থান ক'রে কেবল কাশফী অবস্থাতেই উহা কেউ দেখতে পারে; বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে না।

তাঁর ভাষায়—

انسان زمانۂ سیر سلوک میں اپنے واقعات کشفیہ میں بہت سے عجائب بات دیکھتا ہے

এই কাশফী অবস্থা হয়ে থাকে, সেই নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা হীনপ্রবৃত্তিমূলক কারণসমূহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ সেই নিদ্রা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন যে, এমতাবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটেও যেয়ো না।

অতএব, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর 'রোইয়াত' বা খোদা-দর্শনের যদ্দুর সম্পর্ক, উহা হচ্ছে অবধারিতভাবে সেই রোইয়াত বা দর্শন, যা খোদাতা'লার নূরের পর্দার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিস্তৃত সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টি, এবং উহার মূলতত্ত্ব হচ্ছে, সেই সীমা পর্যন্ত লাভ করা, যে সীমা পর্যন্ত যাওয়া পূর্ণ-মানবের জন্য নির্ধারিত ছিল। তার চেয়ে সম্মুখে বাড়ার কোন উল্লেখ নেই।

সুতরাং 'হযরত ইকরামাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে তিরমিযী-কিতাবুত্-তফসীরে এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রাব্ব্কে দেখেছেন।' ইকরামা বলেন, যখন আমি উহা শুনলাম, তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহ্তা'লা কী বলেন নি لا تدرکه الابصار و هو يدرک الابصار অর্থাৎ দৃষ্টি আল্লাহ্ পর্যন্ত পোঁছতে পারে না, আল্লাহ্ই দৃষ্টি পর্যন্ত পোঁছেন।' অতএব, আপনি কী করে বলছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'বার তাঁর রাব্ব্কে দেখেছেন?" তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, "তোমার মঙ্গল হোক! এ হচ্ছে সেই রো'ইয়াত বা খোদা-দর্শন, যা তিনি লাভ করেন তখন, যখন আল্লাহ্ তাঁর সেই নূরের দ্বারা আলোকসম্পাত করলেন, যা হচ্ছে তাঁর নূর।"

তবে সেই নূর কী? হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যে, "আল্লাহ্র পর্দা বা আবরণ আছে, এবং সেই পর্দা বা আবরণ ব্যতীত অধিক কিছু পরিদৃষ্ট হতে পারে না।

যদি হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বজগৎ নস্যাৎ হয়ে যাবে। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু অস্তিত্ব হারিয়ে অনস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে পড়বে। অতএব, উল্লেখিত হাদীস দু'টিতে যে-কেউ বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, সে উভয় নূর থেকেই বঞ্চিত হবে। প্রথমোক্ত হাদীস বর্ণিত নূর থেকেও এবং শেষোক্ত হাদীস বর্ণিত নূর থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়বে। অতএব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যে রোইয়াত বা খোদা-দর্শন করানো হয়েছে— হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, উহা তো সেই নূরের জ্যোতির্বিকাশের দ্বারা দেখানো হয়, যে-নূরের জ্যোতির্বিকাশের দ্বারা খোদা পরিদৃষ্ট হতে পারেন। এরপর সে আয়াতটি পাঠ করুন যেখানে বলা হয়েছে نور على نور অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নূরের উপর, আর্‌শ থেকে আল্লাহ্‌র যে নূর অবতীর্ণ হয়েছে উহা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নূরের সাথে এসে একান্তভাবে মিশে গেছে—একীভূত হয়েছে। উভয় একই শ্রেণীর জিনিষ ছিল, যা একটি আরেকটির সাথে মিলিত হওয়ার দরুন ওরূপ অসাধারণ জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়েছে, যেমন প্রচণ্ড শক্তিতে কোন প্রস্রবণ উৎসারিত হয়ে, তাতে অসামান্য মর্যাদা যোগ হয়। তবে এই নূর হচ্ছে মখলুক বা সৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার মৌলিক নূর সৃষ্ট নয়। এ পার্থক্যটি সর্বদা দৃষ্টিগোচর রাখবেন, যাতে আপনারা শির্‌কে লিপ্ত না হন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেখানেই যা বলেছেন, ওগুলোতে লেশমাত্রও কুরআন ও হাদীসের বিরোধী কোন কথা নেই। পবিত্র কুরআন ও হাদীস স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নূরকে মখলুক বা সৃষ্ট বলেই আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুতঃ খোদাতা'লা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুকে স্ব স্ব মর্তবা ও মাকাম অনুযায়ী নূর বলে অভিহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তু, যা তাঁর সৃষ্ট, উহাতে তাঁর কিছু না কিছু জ্যোতিঃ অবশ্যই মজুদ রয়েছে। এবং প্রত্যেক জ্যোতির্বিকাশ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে উহার অভ্যন্তরীণ নূর অর্থাৎ অভ্যন্তরে যে আল্লাহ্ রয়েছেন, তাঁর নূরের পর্দাস্বরূপ। কেননা, এই পর্দা ব্যতিরেকে আমরা তাঁকে কখনও দেখতে পারি না।

অতএব, ঐ উদ্ধৃতিসমূহের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিপাতে এ সেই সারসংক্ষেপ, যার সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ আমি আগামী খোৎবায় অন্যান্য কিছু কথা বর্ণনা করবো এবং আলোচ্য বিষয়টির উপরও আরো কিছু আলোকপাত করবো এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে বিভিন্ন তাঁর লিখার মধ্যে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, সেসব উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করবো, যাতে প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে এ দিক থেকে কোনও সন্দেহ-সংশয়মূলক প্রশ্ন থেকে না যায়। আল্লাহ্‌র ফযলে যখন এসব কথা আপনাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তখন আপনাদের মধ্যে সেই নূর প্রজ্জ্বলিত হতে আরম্ভ করবে, এবং আপনাদের ভিতরে যে নূর নিহিত করা আছে তা জেগে উঠতে আরম্ভ করবে। প্রত্যেক মানুষকেই আল্লাহ্ তা

দিয়েছেন। তার প্রকৃতি-স্বভাবে সেই নূর নিহিত করা হয়েছে। কোথাও বাইরে থেকে আসবে না। এই নূর যখন প্রজ্বলিত হবে, তখন আবার আসমান থেকে এক নূর অগ্নি-শিখার ন্যায় আপনাদের উপর অবতীর্ণ হবে। অবধারিতভাবে উহা অবতীর্ণ হবে। কেননা, হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোলামদের উপর তা অবতীর্ণ হয়। তাঁদের চারদিকে সেই নূর বিস্তৃত হতে থাকে এবং তাদের গৃহগুলোতেও উহার মশালসমূহ প্রজ্বলিত হয়েছিল—সেসব প্রদীপ জ্বলতে আরম্ভ করেছিল, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নূরের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়েছিল। অতএব সেই নূরকে নিজেদের স্বত্তায় এই জগতে পুনরায় সঞ্জীবিত করা এবং নিজেদের আত্মাকে অনুরূপ প্রদীপে পরিণত করা, এই দুনিয়ার অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য আবশ্যকীয়।

বস্তুতঃ ইহা এমন কোনও বিষয়-বস্তু নয়, যা কেবল জ্ঞানগত কৌতুহলের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের আত্মা ও সত্তার সাথে ইহার সরাসরি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গে এ বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়-বস্তুটিকে হৃদয়ঙ্গম করলে এবং নূরে পরিণত হলে তবেই কিনা আপনারাও জীবিত হবেন, জীবিত থাকবেন এবং সমগ্র বিশ্ব-মানবমণ্ডলীকে জীবিত করে তোলার যোগ্যতা আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে। যদি ইহা ব্যতিরেকে গাফিলতির অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন, তাহলে মনে রাখবেন, গাফিলতির-ই অপর নাম হচ্ছে অন্ধকার। তারপর, যেসব অন্ধকার থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আগমন করেন সেসব অন্ধকার থেকে আপনারা আর কখনও বেরুতে পারবেন না।

সেজন্য, অত্যন্ত সচেতনতার প্রয়োজন। জাগ্রত হোন। নিজেদের সত্তায় এ সকল নূর তালাশ করুন, যা খোদাতা'লা আপনাদের সত্তায় নিহিত করেছেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর পায়রবিতে সেগুলোকে আলোকিত করুন। অতএব, আমি এ বিষয়-বস্তুটিকে ওরূপ বলেই মনে করি। পরিশেষে আপনাদের সম্মুখে একথাই বলতে চাই যে, **খোদাতা'লার নূর যেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূরের উপর জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়ে ছিল এবং তাতে তিনি "নূরুন আলা নূর"-এ পরিণত হয়েছিলেন, তেমনি আজ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র নূর আমাদের জন্য সে কাজই করে দেখাবে। অতএব, আপনারা আপনাদের সত্তার বিভিন্ন দিক (তাঁর পায়রবির দ্বারা) যতটুকু আলোকিত করবেন সেখানে ততটুকুই মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নূর আপনাদের উপর নাযেল হয়ে আপনাদের মধ্যে এক নূরুন আলা নূর-এর দৃশ্য উদ্ভাসিত করবে।**

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লণ্ডন, তাং ২-৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং)

আহমদকে মুহাম্মদ থেকে তোমরা কীরূপে পৃথক ভাবো ?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রসূল-প্রেম

মূল : মোকাররম সিদ্দীক আশরাফ আলী, কাদিয়ান
অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালামের রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তার সাথে এমন গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো এবং এমন প্রেম ও ভালবাসা ছিলো যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এক ফারসী কবিতায় নিজে বলেছেন—

বা'দ আয খোদা বে ইশ্কে মুহাম্মদ মুখাম্মরম
গার কুফরই বাওয়াদ বাখোদা সখত কাফেরম ॥

অর্থাৎ হে লোক সকল ! আমি খোদাতা'লার প্রেমের পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রেমে বিভোর। যদি কেউ এ কারণে আমাকে কাফের বলে যে, আমি ঐ পবিত্র নবীর একজন প্রেমিক তাহলে খোদার কসম আমি সবচে' বড় কাফের।

যখনই মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রেমের উল্লেখ করা হবে এবং যখনই ঐ পবিত্র নবীর আলোচনা হবে তখন লোকেরা রসূলের এ একনিষ্ঠ প্রেমিকের কথা বলতে বাধ্য হবেন। তিনি লিখে গেছেন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সাথে কীরূপ ভালবাসা পোষণ করতে হয়। তিনি শিখিয়ে গেছেন যে পথগুলো প্রেমাস্পদের দেশের দিকে চলে গেছে সেই পথগুলো কী কী। তিনি শিখিয়ে গেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাঃ)-এর কী কী উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তাঁর (সাঃ) জীবনের যেসব দিক দুনিয়ার নিকট প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা তিনি শিখিয়ে গেছেন আর তিনি বাত্লিয়ে দিয়ে গেছেন ঐ সত্তা কোন্ কোন্ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন এবং বিশ্বে তার কী কী অনুগ্রহ ছিলো। আর মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে তার কতটুকু প্রেমের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও তাঁর এ প্রকৃত প্রেমিককে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই সনাক্ত করেছিলেন এবং তার আবির্ভাবের চিহ্নসমূহও বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। আর তিনি উম্মতকে বলে দিয়েছিলেন যে, যিনি আমার প্রিয় ও যাকে আমি ভালবাসি তিনি শীঘ্রই আবির্ভূত হবেন। তাঁর উম্মতকে বাত্লিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি আমি মুহাম্মদ (সাঃ) হই তাহলে তিনি আহমদ (আঃ)। যদি আমি সূর্য হই তাহলে তিনি চন্দ্র। যদি আমি প্রথমে হই তাহলে তিনি শেষে। আমি হাদী ও পথ-প্রদর্শক হলে তিনি মাহদী ও পথ-প্রাপ্ত। আমি মূসা হলে তিনি ঈসা। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের মধ্যে কেবল এ সত্যিকারের প্রেমিক ব্যতিরেকে আর কাউকে বিশেষভাবে 'সালাম' প্রদান

করেন নি। তিনি বলেছেন, যদি বরফের ওপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয় তাহলে সেখানে পৌঁছাও এবং আমার সালাম পৌছাও। অনুরূপভাবেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ও প্রেম প্রকাশ করার জন্যে বলেছেন, প্রতিশ্রুত মাহদী আমার সাথে আমার কবরে সমাহিত হবেন আর কেয়ামতের দিন আমরা উভয়েই একই কবর থেকে উঠে দণ্ডায়মান হবো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ কথাকে তাঁর কবিতার মধ্যে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা না বুঝে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে পৃথক করতে চায় অথচ তাঁরা উভয়েই একই ও একই সত্তা। তিনি (রাঃ) বলেন—

সাগরেদ নে জো পায়া উসতাদ কি দওলাত হ্যায়।
আহমদ কো মুহাম্মদ সে তুম কেয়সে জুদা সামঝে॥
অর্থাৎ শীষ্য যা পেয়েছেন তা গুরুর ভাণ্ডার থেকে।
আহমদকে মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে তোমরা কীরূপে পৃথক ভাবো।

তাঁর (সাঃ) সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যে প্রেম ছিলো এবং যে ভালবাসা ছিলো তা তার জীবনের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রত্যেক নড়াচড়ায় পরিপুষ্ট হতো। এ উচ্চ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে তার সারাটা জীবন উৎসর্গীত ছিলো। তার লেখাগুলোর মধ্যে, হোক না তা কবিতায় বা গদ্যে, উর্দুতে লেখা হোক বা ফার্সীতে অথবা আরবী ভাষায়, ঐ সকল লেখার প্রতিটি শব্দে শব্দে বরং প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে রসূল (সাঃ)-এর প্রেমের ঝর্ণাধারা পরিলক্ষিত হয়। তিনি মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্তিত্বের সামনে নিজের সত্তাকে একেবারেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। একস্থানে তিনি বলেছেন,

—উস নূর পর ফিদা হুঁ উসকা কি ম্যায় হুয়া হুঁ
উওহ হ্যায় মঁ্যা চিজ কেয়া হুঁ বাস ফয়সালা য়্যাহি হ্যায়
অর্থ: ঐ জ্যোতিতে আমি বিলীন, আমি তাঁরই হয়ে গেছি।
তিনিই আছেন, আমি কি বস্তু অর্থাৎ কিছুই না আর আসল মীমাংসা ইহাই॥

আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে যে উচ্চ ও উন্নত স্থান দান করেছিলেন তা কেবল ঐ পবিত্র নবী (সাঃ)-এর ভালবাসা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের কল্যাণে দান করেছিলেন। তিনি লেখেন:

"তিনি আমাকেও কথোপকথনের সম্মান দান করেছেন। কিন্তু এ সম্মান আমার কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণে লাভ হয়েছে। যদি আমি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মত না হতাম এবং তাঁর (সাঃ) অনুসরণ না করতাম,

যদি দুনিয়ার পাহাড়গুলোর সম পরিমাণ আমার পুণ্য কর্ম হতো তাহলেও কখনও এ কথোপকথনের সম্মান অবশ্যই পেতাম না।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া: ১২-১৩ পৃষ্ঠা)

তিনি পুনরায় বলেন—

"আমি তাঁর অনুসরণের ও তাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে ঐশী নিদর্শনাবলীকে নিজের ওপরে অবতীর্ণ হতে এবং অন্তর দৃঢ়-বিশ্বাসের জ্যোতিতে পূর্ণ হতে দেখেছি। আর এত অলৌকিক নিদর্শন দেখেছি যে, এসব সুস্পষ্ট জ্যোতিসমূহের মাধ্যমে আমি খোদাকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছি।" (তিরয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা-৫)।

তিনি আরও বলেন—

"সুতরাং আমি কেবল খোদার অনুগ্রহে, নিজের কোন পুণ্যের দ্বারা নয়, পরিপূর্ণ অংশ লাভ করেছি যা আমার পূর্বের নবী ও রসূলগণ এবং খোদার মনোনীত বান্দাগণকে দেয়া হয়েছিলো। আর আমার এসব কল্যাণ লাভ করার সম্ভাবনা ছিলো না। যদি আমি আমার নেতা ও প্রভু নবীদের গর্ব শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসরণ না করতাম। সুতরাং আমি যা লাভ করেছি তাঁর অনুসরণে লাভ করেছি। আমি সত্যিকারের ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত যে, কোন মানুষ ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদার সন্নিধানে পৌঁছতে পারে না।"

(হাকীকাতুল ওহী, ৬২ পৃষ্ঠা)

তিনি এ বিষয়-বস্তুকে তাঁর একটি কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন—

হাম হুয়ে খায়রে উমাম তুস সে হি আয়ে খায়রে রসূল
তেরে বাড়হুনে সে কদম আগে বাড়হায়া হামনে॥

অর্থ—আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি তা তো তোমার মাধ্যমে হে শ্রেষ্ঠ রসূল!
তোমার সম্মুখে আগাবার কারণে আমাদের পদ আগে বেড়েছে॥

তার ভালবাসা কেবল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং আলে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার উদ্দীপনাময় প্রেম ছিলো। হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রাঃ) বলেন যে, একবার মহররমের দিনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের সমবয়সী শিশুদের নিকট কারবালার ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। শাহাদতের বর্ণনা করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। তিনি আঙ্গুল দ্বারা চোখের পানি মুছতে ছিলেন এবং বলতে ছিলেন যে, আল্লাহ্তা'লা ইয়াযিদের ওপরে অভিসম্পাত বর্ষণ করুন সে আমাদের প্রিয় নবীর দৌহীত্রকে শহীদ করেছে। এথেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, পবিত্র নবীর জন্যে তার কত ভালবাসা ছিলো যে চৌদ্দশ' বছর

পূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মরণ তার অন্তরকে কতটা বিচলিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে দিতো।

দুই জগতের সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে তার এ পবিত্র ভালবাসার ফলে ইসলামের কোন শত্রু, বিশেষ করে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রদানকারী কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলাও তিনি পসন্দ করতেন না। বরং তার সালাম গ্রহণ করাকেও তিনি পসন্দ করতেন না। এক সময়ের ঘটনা আছে যে, তিনি রেলওয়ে স্টেশনে কোন গাড়ীর অপেক্ষায় সাহাবা কেরামসহ অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে তার ঘোরতর দুশমন পণ্ডিত লেখরাম এদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। আর্য সমাজীদের এ নেতা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খুবই গালি-গালায করতো। সে থেমে গিয়ে হযরত আকদস (আঃ)-কে সালাম করে। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। সে এই ধারণায় যে, হয়ত তিনি শুনেন নি তাই পুনরায় সালাম দিলো। কিন্তু তিনি এবারও চুপ থাকলেন। এরপর সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ হুযূর (আঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, লেখরাম আপনাকে সালাম দিচ্ছে। তিনি বড়ই প্রতাপের সাথে বল্লেন, আমার প্রভুকে গালি দেয় আর আমাকে সালাম করে ?!

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তার ওপরে খৃষ্টান ও আর্য সমাজীদের অপবিত্র লিখিত আক্রমণে তাঁর (আঃ) অন্তরে খুবই ব্যথা লাগতো আর তিনি খুবই বিচলিত হতেন। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন একাজ থেকে বিরত থাকে।

নিম্নোক্ত লেখাটি পড়লে বুঝা যাবে যে, তিনি কতখানি কষ্ট পেতেন। তিনি বলেন—

“খোদার কসম! যদি আমার সন্তানাদি, এবং তাদের সন্তানাদি, আমার সকল বন্ধু-বান্ধব, আমার সকল সহায়তাকারী ও সাহায্যকারীকে আমার চোখের সম্মুখে হত্যা করা হয়, স্বয়ং আমার হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং আমার চোখের মণি উপড়িয়ে ফেলা হয় আর আমাকে আমার সকল আশা-আকাঙ্খা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং আমার সকল আনন্দ ও সকল আরাম-আয়েশ আমি হারিয়ে বসি তাহলে এ সকল কথার মোকাবেলায় আমার জন্যে এ দুঃখ অধিক ভারী যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে এরূপ অপবিত্র আক্রমণ করা হয়।” (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, আরবী অংশের অনুবাদ)।

অনুরূপভাবে অন্য একস্থানে বলেন—

“আমি সত্য সত্যই বলছি যে, আমরা বিষাক্ত সাপদের ও মরুভূমির ভেড়াদের সাথে সন্ধি করতে পারি কিন্তু ঐসব লোকদের সাথে সন্ধি করতে পারি না যারা আমাদের প্রিয় নবী— যিনি আমাদের প্রাণ ও পিতা-মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় তার ওপরে আক্রমণ করে। খোদা

আমাদের ইসলামের ওপরে মৃত্যু দিন। আমরা এমন কাজ চাই না যদ্বারা আমাদের ঈমান বিনষ্ট হতে থাকে।" (পয়গামে সুলেহ, পৃষ্ঠা ৩০)

তার নিজের লোক তো দূরের কথা অন্য লোকেরাও একথা বিশেষভাবে অবহিত ছিলো যে, রসূল-প্রেমে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের মোকাবেলা করতে পারে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নি। সুতরাং মুসলমানদের বড় নেতা স্যার ফযল হুসায়েন সাহেব যার সঙ্গী হিসেবে হযরত চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ) এবং ডঃ ইকবাল প্রমুখ কাজ করতেন। তাকে কেউ বল্লেন, আপনি তো জাফর উল্লাহ্ খানকে বুকে তুলে নিয়েছেন। তিনি তো এমন একটি জামাতের সদস্য যে, যারা রসূলের অবমাননা করে। (নাউযুবিল্লাহ) এতে স্যার ফযল হুসায়েন সাহেব সত্বর উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভিতর থেকে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের উর্দূ কবিতার বই 'দুর্‌রে সামীন' নিয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, মির্যা সাহেবের ওপরে আপনারা যা ইচ্ছে অপবাদ লাগাতে পারেন কিন্তু এ কবিতা পাঠ করার পরে আমি তো ইহা বলতে পারি যে, তার মত রসূল প্রেমিক আমার চোখে পড়ে নি।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, একবার তিনি সারা রাত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ওপরে দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে কাটিয়ে দিলেন এবং তার প্রাণ ও মন দরূদ শরীফের কল্যাণে সুরভিত হয়ে গেল। ঐ রাত্রেই তিনি কাশ্‌ফ বা দিব্য-দর্শনে দেখলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার ফিরিশ্‌তারা আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন এবং তার বাড়ীর চারিদিকে জ্যোতিঃ ও মেশ্‌ক (মৃগনাভী) পরিপূর্ণ মশকসমূহ নিষ্কাশিত হচ্ছে। সমগ্র পরিবেশ সুগন্ধ ও জ্যোতিতে সুরভিত হয়ে গেছে। খোদাতা'লার ফিরিশ্‌তারা বলেন, দরূদের আকারে যে, উপহার তুমি মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছিলে উহার প্রতিদান খোদাতা'লা এ উপহার প্রেরণ করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামকে খোদাতা'লা ইসলাম ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে আবির্ভূত করেছেন।

তিনি লেখেন—

"একবার আমার নিকট ইলহাম হলো যার অর্থ ছিলো এই যে, মালায়ে 'আলা (উচ্চ স্বর্গলোক)-এর লোকেরা বিবাদে লিপ্ত আছে। অর্থাৎ ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্যে ঐশী কামনায় আবেগে ভরপুর। কিন্তু দূরবর্তী মালায়ে 'আলায় অবস্থানরত সঞ্জীবিতকারী ব্যক্তি নিয়োজিত হওয়া প্রকাশিত হয়নি তাই তারা বিতর্কে লিপ্ত। ইতোমধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, লোকেরা একজন সঞ্জীবিতকারীর অন্বেষণে ব্যস্ত আর এক ব্যক্তি এ অধমের নিকটে আসলো এবং ইঙ্গিতে সে বল্লো, হাযা রাজুলুঁ ইহিব্বু রাসূলুল্লাহ্ অর্থাৎ এই সেই ব্যক্তি যে

আল্লাহ্‌র রসূলকে ভালবাসেন এবং এ কথার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ঐ পদের জন্যে মহান শর্ত ছিলো রসূল-প্রেম। সুতরাং উহা এই ব্যক্তির মধ্যে সত্যতায় পর্যবসিত। (বরাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫-৬)।

আহমদ (আঃ)-এর মর্যাদা অনুমান ও ধারণার থেকেও অধিক।
যাঁর গোলাম হিসেবে দেখো যুগের মসীহ (আঃ) কে॥

তাঁর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি দেখলাম যে, হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম মসজিদে মুবারকে একাকী ছিলেন এবং আস্তে আস্তে পায়চারী করছিলেন ও হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)-এর এ কবিতা পড়ে যাচ্ছিলেন এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো—

কুনতাস্‌ সাওয়াদা লিনাযিরী ফাআমিয়া আলায়কান্‌ নাযিরু।
মান শায়া বা'দাকা ফাইয়ামুত ফাআলায়কা কুনতো উহাযিরু॥

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তো আমার চোখের মণি ছিলে। তোমার মৃত্যু আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। এখন তোমার পরে দুনিয়াতে কেউ মারা যাক বা বেঁচে থাক তাতে আমার কি যায় আসে। তোমার মৃত্যুতেই আমি ভীত ছিলাম।

এ সাহাবী (রাঃ) হযরত আকদস (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত কাঁদছেন কেন? তিনি বল্লেন, এ কবিতাটি আমার খুবই আদরের। হায়! যদি এ কবিতা আমি রচনা করতাম। আল্লাহ্। আল্লাহ্! রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তিনি কতই না ভালবাসতেন।

তিনি চাইতেন যে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় উচ্চারিত যে কোন উত্তম ও প্রিয় কথা তার মুখ থেকেই যেন বের হয়। অথচ রসূল-প্রেমে কোন গদ্য হোক বা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে হযরত আকদস (সাঃ)-এর মোকাবেলাকারী পূর্বেও জন্মগ্রহণ করে নি আর ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করবে না। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম রচিত আরবী কবিতায় বলেন—

জিসমি ইয়াতিরু ইলায়কা মিন শাওকিন 'আলা
ইয়া লায়তা কানাত কুওওয়াতুত্তায়রানী—

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! আমার আত্মাতো তোমার ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে তোমার পদযুগলে কবেই উৎসর্গীত হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার দেহের উড়বার শক্তি লাভ হতো তাহলে আমি উড়ে গিয়ে তোমার নিকটে এসে যেতাম।

একদিকে সর্দার দু'আলম (দুই জগতের নেতা) সারওয়ারে কায়েনাৎ (সৃষ্টির সেরা)

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যাঁর মহান চরিত্র এবং সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের কোন দৃষ্টান্ত নেই আর অন্য দিকে তাঁর (সাঃ) প্রেমিক এবং তাঁকে সবচে' অধিক ভালবাসেন যিনি তার পবিত্র সত্তা হলো হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)। সুতরাং তার রসুল-প্রেম তো এমন একটি সমুদ্র যার মধ্যে যতবারই কেউ ডুব দিবে সে ততবারই অসংখ্য মণি-মুক্তা দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে। তাঁর রসূল-প্রেমের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হবে না। তিনি (আঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন—

ইন্নী আমূতু ওয়ালা তামূতু মুহাব্বাতি
ইউরী বি যিক্‌রিকা ফিত্তুরাবি নিদাঈ

অর্থাৎ আমি তো মরে যাবো কিন্তু হে আমার প্রিয় মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কখনও মরবে না। এবং কখনও নিঃশেষ হবে না। বরং উহা সদা জীবিত থাকবে। এমন কি যে, আমার কবর থেকে তোমার স্মরণের ধ্বনি উত্থিত হবে এবং আমার কবর তোমার স্মরণে পরিচিতি লাভ করবে।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) স্বীয় জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন—

"আমি ভাল করে জানি যে, আমাদের জামাত এবং আমরা যা-ই হইনা কেন ঐ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌তা'লার সমর্থন ও সাহায্য আমাদের সাথী হবে যদি আমরা সিরাতে মুস্তাকীম ও সরল-সুদৃঢ় পথে পদচারণা করি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যথার্থ ও সত্যিকারের অনুসরণ করি, কুরআন শরীফের পবিত্র শিক্ষাকে নিজেদের কর্ম-পদ্ধতি করি, এসব কথাকে আমরা আমাদের কাজে ও অবস্থায় প্রমাণিত করি কেবল কথায় যেন না করি। যদি আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো যে, যদি সারা জগৎ একত্র হয়েও আমাদের বিনাশ করতে চায় তাহলেও (আমরা) বিনাশ হবো না। এজন্যে যে, খোদাতা'লা আমাদের সাথী হবেন। (আল্‌ হাকাম, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা-৪)

অতএব মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমরা আহমদীদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, এ ভালবাসাকে যা কিনা তিনি আমাদের প্রাণে উজ্জীবিত করেছেন যেন মরতে না দিই। ইহাকে যেন কেবল জীবিতই না রাখি বরং জীবন প্রদায়িণী বানিয়ে নিই এবং হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে ব্যক্তিগত প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি করি। এ মহান অনুগ্রহকারীর সাথে যেন স্বয়ং নিজেরাও ভালবাসার সম্পর্ক রাখি এবং শিশুদের অন্তরেও যেন তাঁর (সাঃ) ভালবাসা সৃষ্টি করি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(২৫-৪-৯৭ তারিখের ইন্টারন্যাশনাল আল ফযলের সৌজন্যে)

পত্র-পত্রিকা থেকে

হেবরন ঘটনায় সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত সংসদে

কাগজ প্রতিবেদক : ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কোরআন শরীফের ব্যাপারে জঘন্যতম কুৎসা ও কুরুচিপূর্ণ পোষ্টার প্রচারে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গতকাল সর্বসম্মতিক্রমে একটি নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ নিন্দা প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করেন ও সংসদে উপস্থিত সকল সদস্যরা তুমুল টেবিল চাপড়ানের মাধ্যমে তা গ্রহণে সম্মতি দেন।

নিন্দা প্রস্তাবে বলা হয়, 'ইহুদি কুচক্রীমহল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে যে জঘন্য, কুরুচিপূর্ণ এবং অবমাননাকর পোষ্টার প্রকাশ ও প্রচার করেছে এই সংসদ কঠোরতম ভাষায় তার নিন্দা এবং এ ব্যাপারে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এই হীন ও চক্রান্তমূলক আচরণ কেবলমাত্র বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিতেই প্রচণ্ড আঘাত করেনি বরং সারাবিশ্বের বিবেকবান মানুষকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলমান এই ধরনের ঘৃণ্য চক্রান্তকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে। এই সংসদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রের সুসংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এবং এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্যে জোর দাবি জানাচ্ছে।

প্রস্তাবে বলা হয়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে চলমান প্রচেষ্টা ধুলিসাৎ করার জন্যে এ ধরনের একটি ঘৃণ্য চক্রান্ত করা হয়েছে বলে এই সংসদ মনে করছে। তাই এই সংসদ এই ধরনের অশুভ প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপপ্রয়াস চালানো থেকে বিরত থাকার জন্যে সকল অশুভ মহলকে হুশিয়ার করে দিচ্ছে।'

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, 'এই সংসদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশ প্যালেষ্টাইনিদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ এবং একটি স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে সব সময়ই দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে আসছে। এই সংসদ মনে করে যে, জেরুজালেমকে রাজধানী করে, প্যালেষ্টাইনিদের নিজস্ব ভূখণ্ডে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ লক্ষ্যে এবং ইসলাম ও প্যালেষ্টাইনের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ও জঘণ্য তৎপরতা বন্ধে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে সমগ্র বিশ্বের জনগণের প্রতি, সকল রাষ্ট্র ও সরকার দল গ্রূপ, সংস্থার জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং ওআইসির প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ উদত্ত আহবান জানাচ্ছে।

(অবশিষ্টাংশ ৩৮-এর পাতায় দেখুন)

(৩৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

কোন এক ইহুদী মোজাম্মম (অতি নিন্দিত বলে) ডাকতো। ইহা শুনে নবী করীম (সাঃ) হেসে বলতেন, যাঁর নাম মুহাম্মদ (অতীব প্রশংসিত) সে কখনও মোজাম্মম হতে পারে না। নবী করীম (সাঃ)-কে এক ইহুদী আসসামু আলায়কুম (তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হও) বলতো আস্‌সালামু আলায়কুম-এর বদলে। হযরত আয়শা নবী করীমকে (সাঃ)-এর প্রত্যুত্তর দিতে বল্লে তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, আমি তো রহমাতুল্লিল আলামীন, আমি কি করে এর প্রত্যুত্তর দিই। অতীব প্রিয় সহধর্মীণির অপবাদদাতাকে তিনি (সাঃ) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কোন শাস্তি দেননি। এমন কি তাঁর নিন্দাকারী চরম মোনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন ওবায় বিন সলুলের জানাযার নামাযও পড়িয়েছিলেন তিনি।

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা কখনও কোন দুষ্ট-ব্যক্তির আল্লাহ্‌-তা'লার আয়াত বা মহামানবের অবমাননার জবাবে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবার নজির পাই না যা কিনা এখনকার দিনে প্রদর্শিত হচ্ছে। তবে উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, অবমাননাকারীর সাথে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করলে চলবে না। তাকে উপদেশ দিতে হবে এবং নসীহত করতে হবে। ইসলাম ও এর নবীর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য তার সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি যেকোন ব্যক্তির কোন অবমাননাকর কার্য্যে বা কথায় আমরা ব্যথিত হই—আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় একথা আমরা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখাতে আমরা কখনও কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য ও অবমূল্যায়ন করতে পারি না। আমাদের প্রিয় খলীফা (আইঃ)-এর নির্দেশ—আজ কুরআনের শিক্ষার সীমার ভিতরে থেকে কুরআনের অস্ত্রগুলোকে হাতে নিয়ে নিজেদের আত্মাভিমানের বহিপ্রকাশ ঘটান। আমরা তাই করে যাচ্ছি এবং করতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্‌।

আমাদের প্রিয় নবী করীম (সাঃ)-কে নিয়ে ও কুরআনকে নিয়ে ইসরাঈলের কোন এক দুর্মুখ দুরাচার মহিলার অপকর্ম আমাদেরকে ব্যথিত করেছে। এর নিন্দা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমরা আশা করি কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা তাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন।

এখন রবিউল আউয়াল মাস। এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য সারা দুনিয়ার সামনে ইসলাম, আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ও আল্‌-কুরআনের মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে তুলে ধরা। যারা ইসলামের বিরোধিতা করছে তাদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য ধরা পড়লে তারা আর বিরোধিতার হস্ত প্রসারিত করবে না এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

সারা মুসলিম উম্মাহ্‌, এমনকি আমাদের দেশের সংসদ—সরকারী ও বিরোধী দলীয় সাংসদ সম্মিলিতভাবে উক্ত মহিলার অপকর্মের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব করেছেন। আমেরিকা এ প্রসঙ্গে নিন্দা

করেছে এবং খোদ ইসরাঈল সেই পাপিষ্ঠাকে গ্রেফতার করেছে। আমরাও তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এরপরেও আমাদের দেশের কতিপয় তথাকথিত ইসলামী রাজনৈতিক দল ১৫ই জুলাই '৯৭ হরতাল ডেকে এর নামে এক রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছে। ইহাকে কোনভাবেই ইসলামী পদক্ষেপ বলা যায় না। যখন কিনা দেশ বন্যা কবলিত তখন দেশের জনগণকে আর এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়ার খেলায় তারা মেতে উঠেছেন; অথচ দুনিয়ার আর কোন ইসলামী রাষ্ট্র বা সংস্থা হরতাল বা এ ধরনের কোন প্রকার কর্মসূচী দেননি। হরতাল, বিক্ষোভ, লংমার্চ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইসলামের শিক্ষার গণ্ডি বহির্ভূত। এতদ্দ্বারা যে দেশের ও জনগণের প্রভুত ক্ষতি সাধিত হয় তা হরতালের আহ্বানকারীগণও ভালভাবে অবহিত। আমাদের দেশে হরতাল করলে ইসরাঈলের কি ক্ষতি হবে? এ কি নিজের কান কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের প্রতিফলন নয়? আমরা তাদের শুভ-বুদ্ধি দানের জন্যে পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করছি আর দেশবাসীকে এ সব তথাকথিত ইসলাম-পসন্দ লোক ও দলগুলোকে চিনে রাখতে অনুরোধ করছি।

(৩৬-এর পাতার পর)

প্রস্তাবটি গ্রহণের আগে এ ঘটনার ব্যাপারেই ৩শ' বিধিতে সংসদে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং দোষিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতির পর বিরোধী দলীয় উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপির কেএম ওবায়দুর রহমান, জাতীয় পার্টির এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি, জামা'তের দেলওয়ার হোসেন সাঈদী এবং ডাক তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন। বিরোধী দলীয় সদস্যরা তখন বলেন, শুধুমাত্র ৩শ' ধারায় বিবৃতি দিয়েই এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ শেষ হয় না। এ জন্যে সকল সদস্যকে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করে তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে হবে। মোহাম্মদ নাসিম তখন বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতিতেই সকল দলের, সকল সংসদের এবং সকল মানুষের প্রতিবাদের ভাষা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে সকলের সেন্টিমেন্ট একীভূত হয়েছে। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিবৃতিতে দেশের সকল মানুষের পক্ষ থেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছি। সবাই চাইলে সংসদে এ ব্যাপারে নিন্দা প্রস্তাবও উত্থাপন করবো। স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীও তখন এ নিন্দা জ্ঞাপনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি তখন বলেন, আমরা সর্বসম্মতভাবে নিন্দা প্রস্তাব তৈরি করেই সংসদে পাস করবো। তার সঙ্গে বসে সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব তৈরির জন্যে তিনি প্রত্যেক দল থেকে একজন করে সদস্যকে বিরতির সময় তার কার্যালয়ে যেতে অনুরোধ জানান। সংসদে সকল দলের সদস্যরা স্পিকারের বক্তব্যকে স্বাগতম জানান। এরপর মাগরিবের নামাযের বিরতির পরই সর্বসম্মতভাবে উত্থাপিত নিন্দা প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (৭-৭-.৭ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

সম্পাদকীয়

মুহাম্মদ (সাঃ) মানে অতীব প্রসংশিত

মানব দেহ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব-কোষ দ্বারা গঠিত। আবার এ কোষগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী দ্বারা এমনভাবে সংবদ্ধ যে, দেহের যে কোন কোষে সামান্য আঘাতে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত দেহের কোষগুলো প্রতিক্রিয়া দেখাতে আরম্ভ করে, ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান এমনভাবে আক্রান্ত হয় যে, অবস্থা খারাপ হলে গোটা দেহটাকে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি অনেক সময় মারা পড়তে হয়। তাই প্রতিক্রিয়া দেখানো ভালো ; কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিহীন প্রতিক্রিয়া কখনও কল্যাণকর নয়।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন ধর্ম। এর অনুসারীরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে একদেহ একমন হয়ে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তাঁর উম্মত একই দেহতুল্য। এর এক অংশ ব্যথিত হলে অন্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ার দরকার। আর হচ্ছেও তাই। উম্মতের কোন অংশে আঘাত আসলে অন্যান্য অংশও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। তবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করারও একটি ধরন আছে। উপরোক্ত দেহ-কোষ-তুল্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণ ইসলামী দেহের জন্যে কোনক্রমেই মঙ্গলজনক ও বাঞ্ছনীয় নয়। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে ইসলামী দেহকে অসুস্থ ও মলিন করে তবে ছাড়ে।

নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াত দু'টোতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে :

(১) "এবং তিনি তোমাদের জন্য এ কিতাবে নাযেল করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমুহ সম্বন্ধে শুন যে, ওগুলোকে অস্বীকার করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না যে পর্যন্ত না উহা ব্যতিরেকে তারা অন্য কথায় রত হয়। সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুরূপ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সব মোনাফেক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (সূরা নিসা : ১৪১ আয়াত)

(২) "যখন তুমি তাদেরকে দেখ যারা আমাদের আয়াতসমূহের ব্যাপারে লাগামহীন, ভিত্তিহীন অবান্তর কথায় মগ্ন হয় তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উহা ব্যতিরেকে অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সাথে বসবেন না। আর যারা তাকৃওয়া অবলম্বন করে তাদের ওপরে উহাদের হিসাব-নিকাশের কোন অংশ বর্তিবে না, কিন্তু (তাদের জিম্মায়) উপদেশ দান করার দায়িত্ব রয়েছে যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা আনআম : ৬৯-৭০ আয়াত)

হাদীস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে

(অবশিষ্টাংশ ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

Ist Issue 15th July, 1997

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM Tv AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

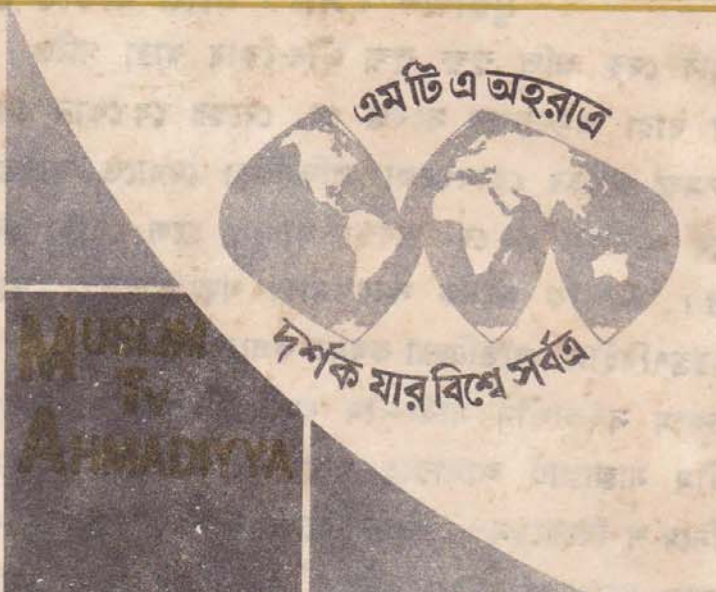

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহাটস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272